পৌরাণিক গল্প

হরিশংকর জলদাস

পৌরাণিক গল্প লেখা সহজ, আবার কঠিনও।

সহজ এজন্য যে, গল্পের সূত্রসমূহ পুরাণবৃত্তান্তে পাওয়া যায়; কঠিন এজন্য যে, পুরাণকাহিনির সঙ্গে বর্তমানের মানবজীবনকে মিলাতে হয়। শেষেরটা দুরূহ।

হরিশংকর জলদাস তাঁর পৌরাণিক গল্পে ওই দুরূহ কাজটিই করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশে পৌরাণিক গল্প খুব যে লিখা হয়, এমন নয়। বলা যায়, হরিশংকর এককভাবে পৌরাণিক গল্প-উপন্যাস লিখে যাচ্ছেন, এই দেশে।

তাঁর ছোটগল্প সংখ্যা খুব বেশি নয়, টেনেটুনে আশি-পঁচাশি। তাদের মধ্যে তেরোটি পৌরাণিক গল্প। ওই তেরোটি গল্পেরই সন্নিবেশ ঘটেছে এই গ্রন্থে।

লেখকের পৌরাণিকগল্পগুলো নিছক পুরাণ-নির্ভর কাহিনি নয়, বাঙালি এবং তার সমাজজীবনের বাস্তবচিত্রও। গল্পগুলোতে মানবজীবন আর দেবজীবন একাকার। এখানে আছে দেবতার দুরাচারিতা, আছে দানবের মহানুভবতা। সুর ও অসুরের মিলন-দ্বন্দ্বের কথা গল্পগুলোর পরতে পরতে।

'উচ্ছিষ্ট', 'যমুনাজলে বিবর সন্ধান', 'তুমি কে হে বাপু', 'কুন্তীর বস্ত্রহরণ', 'দূর দিগন্তে অন্ধকার', 'ব্যর্থ কাম', 'সহোদর', 'উপেক্ষিতা', 'দেউলিয়া'–এসব গল্পে মানব-দানব-দেবতার প্রাপ্তি-বেদনা, ক্ষরণ-লোভ, রিরংসা-জিঘাংসা, প্রেম-অপ্রেমের কথা খুলেমেলে ধরেছেন লেখক। প্রতিটি গল্প বিষয়ে ও ভাষায় স্বতন্ত্র।

সব লেখাতে যেমন, এখানেও হরিশংকর জলদাসের ভাষা সহজ ও মনোরম।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

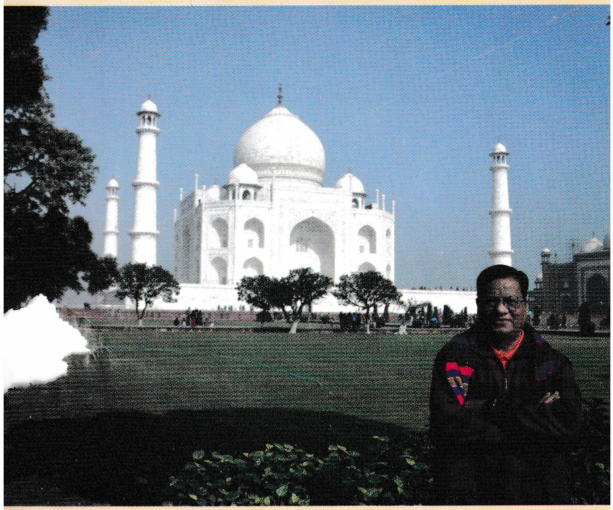

১৯৫৩-র ৩ মে হরিশংকর জলদাসের জন্ম।
চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গার জেলেপল্লিতে।
সমাজ-লাঞ্ছিত হয়ে মধ্যবয়সে লিখতে বসেছেন।
পঞ্চাশ বছর বয়সে লিখেন প্রথম উপন্যাস *জলপুত্র*।

উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ :

জলদাসীর গল্প, গল্প, চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির বৃত্তান্ত, ক্ষরণ, আহব ইদানীং, মাকাললতা, যুগল দাসী, গগন সাপুই, প্রান্তজনের গল্প।

উল্লেখযোগ্য উপন্যাস :

জলপুত্র, দহনকাল, কসবি, রামগোলাম, আমি মৃণালিনী নই, রঙ্গশালা, মোহনা, একলব্য, সুখলতার ঘর নেই, মৎস্যগন্ধা, বাতাসে বইঠার শব্দ, কুন্তীর বস্ত্রহরণ।

বহুপ্রশংসিত গ্রন্থ :

জীবনানন্দ ও তাঁর কাল, নোনাজলে ডুবসাঁতার, কৈবর্তকথা, নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন, আমার কর্ণফুলী, নতুন জুতোয় পুরনো পা।

পুরস্কার ও সম্মাননা অনেক।

উল্লেখযোগ্য–

প্রথম আলো বর্ষসেরা বই পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, ব্র্যাক ব্যাংক-সমকাল সাহিত্য পুরস্কার, সিটি-আনন্দ আলো সাহিত্য পুরস্কার, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন পদক, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ সাহিত্য পদক।

২০১২-তে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার।

২০১৯-এ একুশে পদক।

পৌরাণিক গল্প

পৌরাণিক গল্প

হরিশংকর জলদাস

অনন্যা

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা
anannyadhaka@gmail.com
www.ananya-books.com

© লেখক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অক্ষর বিন্যাস
তন্বী কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

দাম : ২৭৫.০০ টাকা

ISBN 978-984-95285-6-2

Pouranik Galpo by Harishankar Jaladas
Published by Monirul Hoque, Ananya, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
First Published : February 2021, Cover Design : Dhrubo Esh
Price : 275.00 Taka Only

U.S.A. Distributor ❑ **Muktadhara**
37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, N.Y. 11372

Kolkata Distributor ❑ **Naya Udyog**
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700006, India

ঘরে বসে **অনন্যা**'র বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/ananya

উ|ৎ|স|র্গ

পিয়াস মজিদ

কোনো কোনো বই কাউকে কাউকে
উৎসর্গ করতে গিয়ে সাতপাঁচ ভেবেছি।
'পৌরাণিক গল্প' বইটি উৎসর্গ করতে
গিয়ে ক্ষণকালও ভাবিনি। পিয়াস
আমার ভালোবাসার জন।

সূচিপত্র

উচ্ছিষ্ট ৯
অনার্য অর্জুন ২২
দেউলিয়া ৩২
তুমি কে হে বাপু ৪০
আজকের দ্রৌপদী ৫০
যমুনাজলে বিবর সন্ধান ৬১
সহোদর ৭১
একটি হাত, ডান হাত ৮১
তিতাসপাড়ের উপাখ্যান ৮৯
কুন্তীর বস্ত্রহরণ ১০৫
উপেক্ষিতা ১১৮
ব্যর্থ কাম ১২৬
দূর দিগন্তে অন্ধকার ১৩৩

উচ্ছিষ্ট

আমি কে, জিজ্ঞেস করছেন?

হ্যাঁ, বলুন তো আপনি কে?

আমি মন্দোদরী। মন্দোদরী আমার নাম।

কোন মন্দোদরী বলুন তো!

এককথায় তো আমার পরিচয় দেওয়া যাবে না।

তাহলে! তাহলে না হয় দু-চার কথায় বলুন।

আমার পরিচয় তো অনেকগুলো।

অনেকগুলো!

হ্যাঁ, অনেক পরিচয়ের মধ্যে তিনটি পরিচয়ের কথা বলতে পারি।

তা-ই বলুন। ওই তিনটি পরিচয়ের কথাই বলুন।

আমার প্রথম পরিচয় আমি লঙ্কাধিপতি রাবণের প্রধান মহিষী।

প্রধান মহিষী কেন? একমাত্র নন কেন?

রাজা রাবণ তো বহুভোগী! যেখানে যে-নারীটি চোখে লেগেছে, ধরে নিয়ে এসেছে। রক্ষিতাশালায় রেখেছে। রাজ্যলোলুপতার সঙ্গে নারীলোভও তার চরিত্রের প্রধান অনুষঙ্গ।

আপনাকেও তেমন করে ধরে এনেছেন বুঝি? জোর খাটিয়ে?

না, আমার বেলায় সেরকম কিছু হয়নি। আমার বাবাই রাবণের হাতে তুলে দিয়েছে আমায়।

সে কেমন! খোলসা করবেন একটু?

বলছি। আপনি তো জানেন, জগৎ-সংসারের মানুষদের সুর আর অসুর—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সুর মানে দেবতা, অসুর মানে দানব। দেবতারা ভালো, সৎ, সত্যবাদী। অসুররা খারাপ, মিথ্যেবাদী। এই যে সৎ-অসতের কথা বললাম, তা নির্ধারণ করেছে কারা জানেন? ওই দেবতারাই। সুরদের হাত দিয়েই তো শাস্ত্র-শ্লোক—এসব লিখিত হয়েছে।

তাই নাকি!

মুনিঋষি, আর্য, বাল্মীকি—এঁরা তো দেবতা সমর্থনকারী।

আপনি প্রশ্নোত্তর থেকে সরে গেছেন।

সরে যাইনি। বিস্তারিত করতে গিয়ে কথার পিঠে কথা এসেছে।

তারপর?

অসুররাই-বা কম যাবে কেন? সুররা রাজধানী বানাল তো, অসুররাও বানাল। সুরদের আবাস স্বর্গে, ধরাছোঁয়ার বাইরে। আর অসুরদের জন্ম-বেড়ে ওঠা এই মর্ত্যধামে। তাই তাদের রাজধানী-রাজপ্রাসাদ এই ধরাধামে। সুরদের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বিশ্বকর্মা। স্থাপত্যশিল্পী তিনি। ভবন-উদ্যান প্রভৃতির নির্মাতা।

এরকম খ্যাতিমান শিল্পী অসুরদের ছিল না বুঝি?

থাকবে না কেন? অবশ্যই ছিল। সেটাই বলতে চাইছি আপনাকে।

বলুন।

অসুররা পিছিয়ে থাকবে কেন? তাদের মধ্য থেকে তৈরি হলো একজন জাতশিল্পী।

তৈরি হলেন! নাম কী তাঁর?

ময়দানব। ইনি স্বর্গশিল্পী বিশ্বকর্মার মতো দক্ষ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রেয়তরও।

ওঁর গুণাবলি?

বলে শেষ করা যাবে না। দু-চারটি বলছি। ময়দানব বহু বছর সাধনা করেছেন। শুক্রাচার্যকে তুষ্ট করেছেন। শুক্রাচার্য দানবদের কুলপুরোহিত। বহু গুণান্বিত। শিল্পবিদ্যা তাঁর অধিগত। ময়দানবের ওপর খুশি হয়ে শুক্রাচার্য তাঁর সকল জ্ঞান ময়দানবকে দান করেন। ময়দানব অসুরদের জন্য সুশোভন অরণ্য ও হিরন্ময় প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

আচ্ছা, আপনি প্রথম থেকেই ময়দানব সম্পর্কে বিস্তৃত বলতে চাইছেন! কেন?

কারণ তিনি আমার পিতা।

ময়দানব আপনার পিতা! ত্রিভুবন বিখ্যাত শিল্পীর কন্যা আপনি!

আমি হেমার কন্যা।

হেমা কে?

হেমা আমার মা। আমার মা অপ্সরা ছিল। সীমাহীন রূপবতী ছিল মা।

তাঁর রূপেরই বোধহয় যথার্থ প্রতিফলন হয়েছে আপনার মধ্যে!

তা তো আমি বুঝি না। তবে মায়ের রূপে মুগ্ধ হয়েই বাবা মাকে বিয়ে করেছিল।

আর রাবণ মুগ্ধ হয়ে আপনাকে?

কালক্রমে আমি যুবতী হলাম। ও হ্যাঁ, আমরা থাকতাম কিন্তু ঈর্ষাজাগানিয়া প্রাসাদে। হীরক, বৈদুর্য, ইন্দ্রনীলখচিত স্বর্ণময় এক প্রাসাদ বানিয়েছিল বাবা। অরণ্যভ্রমণের খুব ঝোঁক ছিল বাবার। একদিন বাবা আমাকে নিয়ে বনে ভ্রমণ করতে বেরিয়েছে। ওই অরণ্যেই রাবণের সঙ্গে বাবার দেখা।

রাবণেরও বুঝি অরণ্যভ্রমণের শখ ছিল?

মৃগয়ার শখ ছিল। সেদিন রাবণ মৃগয়ার উদ্দেশ্যেই ওই বনে গিয়েছিল।

আপনাকে দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি?

বাবা মুগ্ধ হলো রাবণকে দেখে। রাবণের দিব্য দেহকান্তি, তার কথাবার্তার ধরন, তার বিনয়—এসবে আত্মহারা হলো বাবা।

মানে বিহ্বল হলেন?

বিহ্বলতা বাবাকে দুর্বল করল। নিজের ব্যক্তিত্বের কথা ভুলে গেল বাবা।

তাতে কী হলো?

নিজস্বতা ভুলে বাবা নিয়মবহির্ভূত এক কাজ করে বসল।

নিয়মবহির্ভূত!

পুরুষেরাই নারীর পাণিপ্রার্থনা করবে, এটাই প্রথা।

আপনার বাবা বুঝি প্রথা ভাঙলেন?

প্রথা ভেঙে বাবা বলল, যুবক, তোমাতে মুগ্ধ আমি। তুমি কি আমার মেয়েকে বিয়ে করবে?

রাবণ কী করলেন?

ও তো কামুক! বাবা তো আর জানত না তার কামুকতার কথা! আমিও না। বাবার কথা শুনে রাবণ এককথায় রাজি হয়ে গেল। তবে বিয়ে দেওয়ার আগে বাবা একটা শপথ রাবণের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছিল।

কী শপথ?

আমাকে রাজপ্রাসাদের প্রধান মহিষী করতে হবে।

রাবণ তো তাই-ই করেছিলেন?

হ্যাঁ, করেছিল। প্রধান রানি হয়েছিলাম বটে, কিন্তু রাবণের নারীলিপ্সা বন্ধ করতে পারিনি।

তার জন্যই তো সীতাহরণ?

সে কথায় পরে আসছি। তার আগে আমার দ্বিতীয় পরিচয়ের কথা শুনুন।

বলুন।

আমার দ্বিতীয় পরিচয়, আমি বিভীষণের এঁটো-স্ত্রী।

এঁটো-স্ত্রী মানে!

এঁটো মানে তো জানেন। উচ্ছিষ্ট, ভুক্তাবশিষ্ট। ঝুটা খাদ্যও বলতে পারেন।

নিজের সম্পর্কে এভাবে বলছেন কেন? আপনি এঁটো-স্ত্রী হতে যাবেন কেন? তাও বিভীষণের!

রাবণের স্ত্রী ছিলাম, প্রধান রানি; স্বর্ণলঙ্কার প্রধান মহিষী। আমার চারদিকে তখন ঐশ্বর্য। রামের ওই এক কথাতেই আমি উচ্ছিষ্ট হয়ে গেলাম।

বুঝিয়ে বলবেন? এখানে রাম এলেন কোথা থেকে!

তার আগে বিভীষণ সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে করছে না আপনার?

করছে তো, ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে।

বিভীষণ রাবণের সহোদর। রাবণের পিতার নাম বিশ্রবা। মা নিকষা। আমার শাশুড়ির গর্ভে তিন পুত্র, এক কন্যা জন্মাল। রাবণ, কুম্ভকর্ণ এবং বিভীষণ। কন্যার নাম শূর্পণখা। কুম্ভকর্ণ অলস প্রকৃতির, কিন্তু অমিত শক্তিধর। তার মধ্যে কোনো সৃজনক্ষমতা ছিল না। খেত আর ঘুমাত। আর বড়দা রাবণের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। শূর্পণখার মধ্যে একটা আয় আয় ভাব ছিল। দাদার গুণ পেয়েছিল সে। দাদা যেমন নতুন নতুন নারীর, শূর্পণখাও তেমনি নতুন নতুন পুরুষের অঙ্কশায়িনী হতে চাইত। এ জন্য রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে ঝঞ্ঝাট, সীতাহরণ। সে পরের কথা, আগে বিভীষণের কথা শুনুন।

আপনি একটু থামুন। দম নিন। আপনাকে বেশ বিচলিত মনে হচ্ছে! একটু স্থির হয়ে না হয় বলুন! অনেকক্ষণ কথা বলেছেন আপনি।

আপনারা মীরজাফরকে প্রাণ খুলে গালি দেন, বিভীষণকে কুর্নিশ করেন। বলেন, বিভীষণের মতো মানুষ হয় না। বিভীষণ না হলে শ্রীলঙ্কা রামের পদানত হতো না। লঙ্কাকাণ্ডও সংঘটিত হতো না। আর হতো না সীতা উদ্ধার।

কথাটা তো মিথ্যে নয়! বিভীষণের জন্যই তো রাবণবধ, লঙ্কাজয়।

অথচ এই একমেবাদ্বিতীয়ম বিভীষণের জন্য আপনারা বলেন, ঘরশত্রু বিভীষণ, বেইমান বিভীষণ, ঘর জ্বালানি পর ভুলানি বিভীষণ, বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ। নয় কি?

হ্যাঁ, এটা তো অস্বীকার করার নয়। বিভীষণই তো পরোক্ষভাবে লঙ্কাকে তছনছ করেছে।

মানে নিজের মাতৃভূমির ধ্বংসকে অনিবার্য করে তুলেছে এই বিভীষণ। সে তো ভীষণ নয় শুধু, বি-ভীষণ। বিশেষভাবে ভয়ংকর। তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই লঙ্কা তার শ্রী হারিয়েছে, হারিয়েছে স্বাধীনতা। যুগে যুগে তা-ই হয়ে আসছে—বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বীরত্বের পরাজয় ঘটে আসছে। মহাভারতের দিকে তাকান। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য কি যথাযথভাবে কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন? করেননি! পাণ্ডবদের বিপক্ষে লড়াকু মেজাজ নিয়ে অস্ত্র তোলেননি তাঁরা। তাঁদের মনোভাব ছিল আত্মসমর্পণের। এটা একধরনের বিশ্বাসঘাতকতা। খুব বেশি দূরে যাওয়ার তো দরকার নেই। নিজের দেশের দিকে তাকান না! খন্দকার মোশতাক যদি হারামিপনা না করত, না হতো বিশ্বাসহন্তা, শেখ মুজিব নামের মহিরুহের কি পতন হতো? আপনাদের দেশে এতগুলো আগাছার জন্ম হতো?

ঠিকই বলেছেন আপনি, বিশ্বাসঘাতকেরাই যুগে যুগে ভালোত্বের অবসান ঘটিয়েছে, মহৎ পুরুষদের পতনের পশ্চাতে কলকাঠি নেড়েছে তো তারাই!

আস্ত একটা খলচরিত্র এই বিভীষণ। আর আপনাদের ওই বাল্মীকি, রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি বিভীষণকে বলেছেন ধর্মানুরাগী। আসলে বাল্মীকির পক্ষপাতিত্ব ছিল বিভীষণের প্রতি। তাই তো এত বড় একজন বিশ্বাসহন্তাকে খলনায়ক না বলে ধর্মানুরাগী বলে চালিয়ে দিয়েছেন! বিভীষণের ছিল প্রচণ্ড রাজ্যলোভ। কিন্তু রাবণের সঙ্গে সে শক্তিতে পেরে উঠছিল না। সে জানত, শক্তি দিয়ে কখনো রাবণকে কুপোকাৎ করতে পারবে না। করলে করতে হবে কূটবুদ্ধি দিয়ে। এই সময় বোনের প্ররোচনায় খুব বড় একটা ভুল করে বসল রাবণ, সীতাকে লুণ্ঠন করল। রাবণের এই দুর্বুদ্ধিটাকে কাজে লাগাল বিভীষণ। রামের সঙ্গে গিয়ে ভিড়ল।

সরাসরিই কি রাম-লক্ষ্মণের দলে গেল বিভীষণ? যাওয়ার আগে কোনো পটভূমি তৈরি করল না?

ও তো ভীষণ ধুরন্ধর! ক্ষুরধার বুদ্ধি তার। ধুম করে তো আর রামের শিবিরে যোগ দেওয়া যায় না! রাম তখন বানরবাহিনী নিয়ে লঙ্কার চারদিক ঘিরে ফেলেছে। রাজ্যলোভ তখন বিভীষণের মনে লকলকিয়ে উঠল। হঠাৎ ভালো মানুষ সেজে বসল সে। দাদার কাছে গিয়ে নীতিকথা শোনাতে শুরু করল। বলল, সীতা পরস্ত্রী। তাকে হরণ করে পাপ করেছ তুমি দাদা। সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দাও। নইলে সবংশে রাম তোমায় নিধন করবে। একবারও বলল না বিভীষণ, তাড়কাসহ হাজার হাজার অনার্যকে যে রামরা নিধন করেছে, তার বিহিত কী হবে? রাবণ তো এমনিতেই মাথাগরম

মানুষ, বিভীষণের এরকম ভালোমানুষ সাজার মধ্যে কিসের যেন গন্ধ পেল! আচমকা ভাইকে লাথি মেরে বসে রাবণ!

সুযোগ পেয়ে গেল বিভীষণ। মনে মনে যা কামনা করছিল, তাই তো করে বসলেন রাবণ!

আপনি ঠিকই ধরেছেন। বিভীষণকে পদাঘাত করে ক্ষান্ত হলো না রাবণ, লঙ্কা থেকে বের করে দিল। চারজন অনুগতকে নিয়ে বিভীষণ রামের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলো। রাম তো বিভীষণকে পেয়ে হাতে স্বর্গ পেল! বিভীষণ রামের পদে মাথা ঠেকিয়ে বলল, এখন আমার রাজ্যলাভ আপনার হাতে। আপনার কৃপায় এই শ্রীলঙ্কা এবং আরও অনেক কিছু পেতে পারি আমি। রাম বলল, বিনিময়ে কী পাব আমি? বিভীষণ বলল, আনুগত্য। অনার্য হত্যায় আপনাকে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করব আমি। লঙ্কাধ্বংসে সহযোগিতা করব। সুগ্রীব বলল, রেখে দিন বিভীষণকে, আপনার পায়ের কাছে আশ্রয় দিন।

এই সুগ্রীব কে?

আরেক বিভীষণ, আরেক প্রতারক, আরেক বিশ্বাসঘাতী!

সুগ্রীবের পরিচয় দিতে গিয়ে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন আপনি।

উত্তেজিত হব না! খন্দকার মোশতাকের নাম শুনে আপনি উত্তেজিত হন না? গালি দিতে ইচ্ছে করে না আপনার?

এ্যাঁ হ্যাঁ, করে তো!

মীরজাফর-খন্দকার মোশতাকদের নামান্তর হলো এই বিভীষণ, এই সুগ্রীব।

একটু খুলে বলুন তো! ব্যাপারটা আমার কাছে ঘোলাটে মনে হচ্ছে!

ঘোলাটেই তো। বিশ্বাসঘাতকের কথা বলতে গিয়ে আপনারা মীরজাফর-মোশতাক-বিভীষণের কথা বলেন, কিন্তু সুগ্রীবের নাম উচ্চারণ করেন না কেউ।

দেখছি সুগ্রীবকে আপনি বেশ অপছন্দ করেন! বিশ্বাসঘাতকও বলছেন তাকে। কিন্তু কেন বুঝতে পারছি না।

শ্রীলঙ্কা ঘিরে এই যে সমুদ্র, তার পূর্বপাড়ে বানররাজ্য। বানররাজ্যের রাজধানী কিষ্কিন্ধ্যা। বালী ছিল বানরসাম্রাজ্যের অধিপতি। বালীর স্ত্রী তারা, পুত্র অঙ্গদ এবং ছোট ভাইয়ের নাম সুগ্রীব। বালী ছিল মহাশক্তিশালী। এই যে আমি রাবণ রাবণ করছি, রাবণও বালীর হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছে। শক্তিপরীক্ষায় রাবণকে নাকাল হতে হয়েছে বালীর হাতে। পরে অবশ্য বালীর সঙ্গে রাবণের বন্ধুত্ব হয়। সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। সুগ্রীবের কথা বলি। সুগ্রীব

সুবিধাবাদী। বিভীষণের মতো রাজ্যলোভী। কিন্তু সুবিধা করতে পারছিল না তেমন। একদিন সুযোগ এসে গেল সুগ্রীবের হাতে।

কী সুযোগ?

মায়াবী নামের একজনের সঙ্গে বালীর সংঘর্ষ বাধে এক রাতে। বালী মায়াবীকে তাড়িয়ে এক পাহাড়ের দিকে নিয়ে যায়। সঙ্গে ভাই সুগ্রীব। মায়াবী হঠাৎ এক গুহায় ঢুকে পড়ে। পশ্চাৎ পশ্চাৎ বালীও ঢুকে যায়। ঢুকবার আগে সুগ্রীবকে বলে, তুমি এই গুহামুখে পাহারায় থেকো। আমার না-ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। বালী গুহায় ঢুকে গেলে বিশাল একটা পাথরখণ্ড দিয়ে গুহামুখটি বন্ধ করে দেয় সুগ্রীব।

কেন, কেন বন্ধ করে দেয়!

বালী যাতে আর কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরতে না পারে।

ফিরতে না পারলে কী হবে!

সুগ্রীব কপিরাজ হবে। কিষ্কিন্ধ্যা দখল করবে। তারাকে শয্যাসঙ্গিনী করবে।

এসব কী বলছেন আপনি!

যা সত্যি, তাই বলছি। কিন্তু সুগ্রীবের বাসনা পূরণ হয়নি। বাহুবলে পাথরটা সরিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে এসেছে বালী। তার হাতে মায়াবীর রক্ত, মনে পাহাড়সমান ক্রোধ। সুগ্রীবকে লাঞ্ছিত করে বানররাজ্যের ওপারে পাঠিয়ে দিল বালী।

তারপর?

সীতাকে হারিয়ে রাম তখন পাগলপ্রায়। লক্ষ্মণের কোনো আশ্বাসেই শান্ত হচ্ছে না রাম। ওই সময় গভীর অরণ্যমধ্যে সুগ্রীবকে পেয়ে গেল রাম। সুগ্রীবের প্ররোচনায় রাম নিরপরাধ বালীকে হত্যা করল। সুগ্রীবকে বানররাজ বলে ঘোষণা করল। এইটুকু পর্যন্ত না হয় মেনে নেওয়া যায়...।

কোনটা মেনে নেওয়া যায় না?

এই রাম রানি তারাকে বাধ্য করল সুগ্রীবের অঙ্কশায়িনী হতে।

রানি তারা কী করল?

বেচারি কী আর করবে! প্রথম দিকে তীব্র প্রতিবাদ করল তারা। রাম, ধর্মরাজ নাকি সে, সেই রাম বলল, যদি তুমি সুগ্রীবকে স্বামী হিসেবে মেনে না নাও, তাহলে বালীর যে দশা হয়েছে, তোমার একমাত্র পুত্র অঙ্গদেরও সেই দশা হবে।

মানে!

অঙ্গদকে হত্যা করার হুমকি দিল রাম। স্বামী হারিয়ে দিশেহারা তারা। পুত্র হারাতে চাইল না। রামের কথা মেনে নিল। এখন বলুন, বিভীষণের চেয়ে সুগ্রীব কম কিসে?

রাম তো বিভীষণকে চরণে ঠাঁই দিলেন, মানে প্রতিপক্ষের বড় একটা শক্তিকে নিজের দলে পেয়ে গেলেন রাম। বিভীষণকে দিয়ে কী স্বার্থ উদ্ধার করলেন তিনি?

রাম মহাবিচক্ষণ। বিভীষণের কাছ থেকে স্বর্ণলঙ্কার অন্ধিসন্ধি জেনে নিল। হনুমানকে পাঠিয়ে লঙ্কায় আগুন লাগাল।

তার আগেই তো সীতাকে এনে অশোকবনে রেখেছেন রাবণ? কী ব্যাপার, অশোকবন আর সীতার কথা শুনে এরকম বিষণ্ন হয়ে গেলেন কেন আপনি?

বলছি, সীতাকে যেই গোধূলিতে অপহরণ করে আনল রাবণ, সেই সন্ধ্যায় বা রাতে সীতাকে অশোকবনে পাঠায়নি।

পাঠাননি! তাহলে কোথায় রাখলেন?

রাজপ্রাসাদে, রাবণের শয্যাকক্ষে।

মানে! কী বলছেন আপনি এসব!

যা সত্যি, তাই বলছি। আমি তো প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

প্রত্যক্ষ সাক্ষী!

হ্যাঁ। সীতাকে রাজপ্রাসাদে ঢুকিয়ে দাস-দাসী-প্রহরী-সৈন্য-দেহরক্ষী—সবাইকে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে যেতে নির্দেশ দিল রাবণ।

আপনি!

আমাকেও রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করতে বলল রাবণ। বলল, আজ অন্য কোথাও গিয়ে থাকো তুমি। আজ রাতটা আমার আর সীতার।

আপনি কী করলেন?

রাবণ যেমন নারীলোভী, তেমনি দুর্দান্ত ক্রোধী। ক্রোধানলে যেকোনো জনকে, সে যতই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হোক না কেন, ভস্ম করে দিতে পারে রাবণ। ওই সময় রাবণের চেহারা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম আমি। ছেড়ে গেলাম রাজপ্রাসাদ।

পরদিন?

পরদিন ফিরে এসেছিলাম। সীতা তখন অশোকবনে। বিপর্যস্ত বিপন্ন সীতা তখন মুহ্যমান। এই পাপের ফল পেতে হলো রাবণকে।

সে কেমন?

বিভীষণের কূটবুদ্ধির মারপ্যাঁচে লঙ্কার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। রাবণের শক্তিমত্তার সকল তথ্য রামকে জানিয়ে দিল বিভীষণ। ঘোরতর যুদ্ধে হাজার-লক্ষ অনার্য সৈন্য নিহত হলো রামপক্ষের হাতে। বিভীষণের জ্ঞাতিবিরোধিতার কারণে রাবণ নিহত হলো। বংশে বাতি দেওয়ার কেউ থাকল না তার। রাবণের মৃত্যুবাণের সন্ধান দিয়েছিল এই বিভীষণই।

তারপর?

লঙ্কাকে ছারখার করতে পারায়, সীতাকে উদ্ধার করতে পারায় রাম বিভীষণকে উপহার দিল।

কী উপহার?

লঙ্কার শাসনভার আর আমাকে বিভীষণের হাতে তুলে দিল রাম।

বিভীষণ কী করল?

ধর্মানুরাগী বিভীষণ, হ্যাঁ রামের কাছে, মানে মহাকবি বাল্মীকির কাছে বিভীষণ তো তখন মস্তবড় ধর্মানুরাগী, তো সেই বিভীষণ তড়িঘড়ি করে লঙ্কার সিংহাসনে চড়ে বসল। আর...।

আর?

আমাকে বিয়ে করার ঘোষণা দিয়ে বসল। রাম লঙ্কা ত্যাগ করার আগেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চাইল বিভীষণ।

আচ্ছা, বিভীষণের স্ত্রী-পুত্র ছিল না?

ছিল তো! তার স্ত্রী সরমা, পুত্র তরণীসেন। এই তরণীসেন রাবণের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে রামের হাতে নিহত হয়েছে।

বউ থাকা সত্ত্বেও আপনাকে বিয়ে করল বিভীষণ?

করবে না! নারীলোলুপতা যে ওদের বংশধারায়! নারীভোগের ব্যাপারে রাবণ-বিভীষণে কোনো তফাত নেই। কষ্ট তো শুধু নারীজাতিরই! যেমন সীতা, যেমন তারা, যেমন আমি!

বিয়ের আগে আপনি কোনো বাধা দিলেন না?

আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম আমি। প্রাসাদশীর্ষ থেকে ঝাঁপ দেওয়ার আগে এক প্রহরী দেখে ফেলেছিল আমায়। আমার মরণ হয়নি। বিভীষণ আমাকে বিয়ে করেই ছাড়ল।

অ...।

এখন আপনিই বলুন আমি বিভীষণের উচ্ছিষ্ট-স্ত্রী কি না? আমার জীবন-যৌবন তো রাবণে সমর্পিত ছিল! তার ভোগ্যা ছিলাম আমি। একজনের ভোগ্যা অন্যজনের কাছে উচ্ছিষ্ট নয় কি!

আপনার তিনটা পরিচয়ের কথা বলেছিলেন আপনি। দুটো জানলাম, তৃতীয়টি?

তার আগে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি আমার নামটা খেয়াল করেছেন?

হ্যাঁ, করেছি তো! মন্দোদরী।

মানে?

বুঝলাম না আপনার কথা!

মন্দোদরীর মানেটা কী? বলতে পারলেন না তো! বলছি। মন্দোদরী'তে দুটো শব্দ—মন্দ আর উদরী। মন্দ মানে কী?

মন্দ অর্থ খারাপ।

আর উদর অর্থ?

পেট, জঠর, গর্ভ।

তাহলে মন্দোদরী মানে কী দাঁড়ায়?

যার জঠর খারাপ। যার গর্ভ কুৎসিত।

ঠিক তাই। এত এত নাম থাকতে বাল্মীকি আমার নাম দিলেন মন্দোদরী। মানে আমার পেটে যারা জন্মাবে, তারা সবাই মন্দ। এই তো মানে হয় আমার নামের!

হ্যা, ঠিক তাই তো!

অথচ দেখুন, আমি পেটে ধরেছি মেঘনাদকে। ইন্দ্রজিৎ আমার মেঘনাদের আরেকটা নাম। রাম-লক্ষ্মণের রক্ত জল করে ছেড়েছে যে ইন্দ্রজিৎ, সে আমার সন্তান, গর্ভজাত পুত্রসন্তান।

ঠিকই তো বলেছেন আপনি!

যদি ঠিক বলে থাকি, তাহলে আমার এরকম বিশ্রী নাম কেন? বাল্মীকি ছিলেন আর্য, ঋষি। আর্য যখন কলম ধরেছেন, তাঁর হাতে অনার্যদের সুশোভন নাম হবে কেন? আমার নামের কথা না হয় বাদই দেন, বিভীষণের নামের মধ্যে না হয় যথার্থতা আছে, কিন্তু কুম্ভকর্ণ বা শূর্পণখার নামের মধ্যে? কী ভাবছেন?

না, আপনার কথা শুনে ভাবছি...।

কুম্ভ মানে কলস। কুম্ভকর্ণ মানে কলসের মতো কান যার। শূর্প অর্থ কুলা। যার নখ কুলার মতো, সেই শূর্পণখা। বাল্মীকি রাবণের ভাইবোনের নাম দিলেন এরকম। বিকৃত নাম। এ শুধু নাম তো নয়, দেহগঠনেরও বিবরণ। এ নাম আপত্তিকর। অথচ দেখুন, নিজের প্রিয় চরিত্রগুলোর নাম দিলেন সুগ্রীব, রাম, দশরথ, সীতা, লক্ষ্মণ!

আচ্ছা, বিভীষণ না হয় নিজ স্বার্থোদ্ধারের জন্য সীতাকে ফিরিয়ে দিতে বলেছিল রাবণকে, আপনি বলেননি?

সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বারবার আমি রাবণকে অনুরোধ করেছি। রাবণ কর্ণপাত করেনি। সীতাকে ফিরিয়ে না দেওয়ার ফলে আমাকেও বারবার বানরের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। আপনাদের বাঙালি কবি কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে লিখেছেন—বানররা আমাকে রাজপ্রাসাদ থেকে টেনে বের করে আমার পোশাক পর্যন্ত ছিঁড়ে দিয়েছে। এরকম অপমান তো আমায় রাবণের কারণেই পেতে হলো!

তার পরও রাবণের বোধোদয় হয়নি?

রাবণের কারণেই আমাকে আমার সেরা পুত্রটিকে হারাতে হলো। ইন্দ্রজিৎ আমার গর্ব। আমার মরুজীবনে মরূদ্যান ছিল সে। সে বীর ছিল। বাপের হয়ে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেছিল। দোর্দণ্ডপ্রতাপী মেঘনাদকে কব্জা করা সম্ভব ছিল না রাম-লক্ষ্মণের পক্ষে। দুই ভাইকে নাগপাশ বাণে আবদ্ধ করে সৈকতে শুইয়ে রেখেছিল।

আপনার এই পুত্র দিয়েই তো রাবণ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারতেন!

সহজেই জয়ী হতে পারত রাবণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেঘনাদকে যুদ্ধ করতে দেওয়া হয়নি।

সে কেমন? কে যুদ্ধ করতে দেয়নি!

মোট তিন দিন যুদ্ধ করেছিল মেঘনাদ। দুই দিন যুদ্ধক্ষেত্রে, একদিন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে। প্রথম দুদিন সশস্ত্র থাকলেও শেষদিন পুত্র আমার নিরস্ত্র ছিল।

নিরস্ত্র ছিলেন! নিরস্ত্র হয়ে কি যুদ্ধ করা যায়?

প্রথম দিন রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে মেঘনাদের ভয়ংকর যুদ্ধ হয়। মেঘনাদের অস্ত্রাঘাতে রাম-লক্ষ্মণ মৃতপ্রায়। পুত্রটি বড় বীর ছিল সত্যি, কিন্তু বাস্তবজ্ঞান ছিল না তার। পরাস্ত রাম-লক্ষ্মণকে চিরতরে শেষ করে না দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে রেখে চলে এলো।

তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধি কি কম ছিল?

নিশ্চয়ই। নইলে কেন সে দ্বিতীয় দিনও একই কাজ করবে!

বুঝতে পারলাম না।

আপনিই বলুন ঋণ, অগ্নি, ব্যাধি—এসবের শেষ রাখতে আছে?

না। এদের শেষ রাখতে নেই। এদের নির্মূলেই মঙ্গল।

তেমনি করে শত্রুরও শেষ রাখতে নেই। শত্রুর মৃত্যুও নিশ্চিত করতে হয়। মেঘনাদ কী করেছে জানেন?

কী করেছেন?

যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণ-সুগ্রীব-বিভীষণকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে হত্যা করেনি। মুমূর্ষু অবস্থায় ওদের যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে চলে এসেছে এবং এতেই কাল হয়েছে। যে বিরাট ভুল মেঘনাদ করেছে, নিজের জীবন দিয়ে সেই ভুলের মাশুল গুনেছে মেঘনাদ।

জীবন দিয়ে!

হ্যাঁ। মেঘনাদ আমার, নিজের জীবনের বিনিময়ে সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। বারবার পরাজিত হবার পর কৃতঘ্ন বিভীষণ রামকে বুদ্ধি দিল—মেঘনাদকে যুদ্ধে পরাজিত করা যাবে না। তাকে বাগে আনতে হবে নিকুম্ভিলা মন্দিরে, যখন সেখানে মেঘনাদ যজ্ঞে মগ্ন থাকবে।

মন্দিরে পুজো দিতেন নাকি মেঘনাদ?

কেন, অবিশ্বাস হয় আপনার?

না, বলছিলাম কী, সব পুজোআচ্চা তো আর্যদের জন্য!

মিথ্যে মিথ্যে। অনার্যরা কি ঈশ্বর মানে না? তাদের কি দেবদেবী নেই? তাদের কি পাপপুণ্যবোধ নেই?

বলছিলাম, অনার্যদের তো আর্যশাস্ত্রে বারবার ছোট করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ওরা রাক্ষস, ওরা কীট, ওরা পক্ষী!

এসব ওই আর্যশাস্ত্রকারদের চালাকি। আমাদের দমিয়ে রাখার ফন্দি। তাই তো আজও এই বিশ্বে অনার্যরা ইতর ছোটলোক বলে পরিচিত হয়ে আসছে। আসলে অনার্যরা সর্বার্থে আর্যদের সমকক্ষ ছিল। কিন্তু নানা ফন্দিফিকির করে ওদের সংস্কৃতিকে উদ্ভাসিত হতে দেয়নি ওই রামরা, ওই বাল্মীকিরা।

আপনি বেশ ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেছেন!

মেঘনাদ প্রতিসকালে নিকুম্ভিলা মন্দিরে পুজো দিত। যুদ্ধ শুরু করার আগে একবার নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যেত। পুজো শেষে মেঘনাদ হয়ে উঠত দুর্জয়। বিভীষণ জানত এটা। তাই চোরের মতো এক সকালে লক্ষ্মণ-সুগ্রীব-হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে বিভীষণ নিকুম্ভিলা মন্দিরে উপস্থিত হলো। আহ, পুত্র মেঘনাদ! পুত্র আমার সেসময় পুজোয় মগ্ন ছিল! চোখ বুজে ঘণ্টি বাজিয়ে পুজো করছিল মেঘনাদ!

তারপর! তারপর কী হলো?

পেছন থেকে আক্রমণ করে বসল লক্ষ্মণ। নিরস্ত্র মেঘনাদ প্রাণপণ যুঝে গেছে। কিন্তু সশস্ত্র শত্রুদের সঙ্গে কতক্ষণ আর টিকে থাকা যায়? অস্ত্রের এক আঘাতে লক্ষ্মণ মেঘনাদের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। হোঃ হোঃ হোঃ! পুত্র, পুত্র মেঘনাদ রে!

আপনি ব্যাকুল হবেন না মন্দোদরী দেবী। ধৈর্য ধরুন।

ধৈর্য তো ধরে আছি আমি। নইলে পুত্রহন্তা, স্বামীঘাতক বিভীষণের সঙ্গে ঘর করি!

এটাকে বোধহয় নিয়তি বলে।

নিয়তি! নিয়তি আবার কী! নিয়তির সকল দণ্ড কি শুধু অনার্যের ওপর নেমে আসতে বলেছে! নিয়তির অভিশাপ কি শুধু তারার জন্য, শুধু আমার জন্য? রাবণের জন্য, কুম্ভকর্ণের জন্য? রামের জন্য নয়, লক্ষ্মণের জন্য নয়? কিছু বলছেন না যে! চুপ করে আছেন কেন?

আমি আর কী বলব বলুন!

আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। আমার সকল কথা আপনি শুনলেন। এখন বলুন—আমি কে, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি কী বলব? বলব—আমি নারীভোগী, সীতা লুণ্ঠনকারী, স্বাধীনতাকামী রাবণের স্ত্রী? বলব—আমি কৃতঘ্ন, কুলাঙ্গার, জ্ঞাতিদ্রোহী বিভীষণের উচ্ছিষ্ট বউ মন্দোদরী? নাকি বলব—ঘাতকের হাতে নির্মমভাবে নিহত শ্রীলঙ্কার মহাবীর মেঘনাদের জননী আমি? কোন পরিচয়টা আমার জন্য শ্লাঘার, বলতে পারেন?

এতক্ষণ যে শ্রোতাটি মন্দোদরীর সঙ্গে কথোপকথনে অংশ নিয়েছেন, মন্দোদরীর শেষ প্রশ্ন শুনে মাথা নিচু করলেন তিনি।

অনার্য অর্জুন

পরলোকে একলব্যের সঙ্গে অর্জুনের হঠাৎ দেখা। তাদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হয়। সেই কথোপকথন এখানে লিপিবদ্ধ হলো।

নমস্কার।

তুমি কি আমাকে চেনো?

না।

তাহলে নমস্কার দিলে যে!

এটাই তো নিয়ম, পরলোকের।

বুঝলাম না। খোলসা করবে?

স্বর্গের এটাই তো প্রথা, ছোটরা বড়োদের শ্রদ্ধাসম্ভাষণ জানাবে।

এই প্রথা কে শেখাল তোমায়?

আপনার তো না জানার কথা নয়! নবাগতদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য এখানে একটা কোচিং সেন্টার আছে। ওই সেন্টারে স্বল্পকালীন মেয়াদে স্বর্গের শিষ্টাচার শেখানো হয়। ওই সেন্টারে আমি ট্রেনিং নিয়েছি।

ও—। তাই বলো। আমিও ওখানকার শিক্ষানবিশ ছিলাম একদা। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, বয়সে তুমি বেশ নবীন।

চব্বিশ বছর তিন মাস।

তা তোমার নাম কী?

অর্জুন। অর্জুন আমার নাম।

অর্জুন! কোন অর্জুন! মহাভারতের!

না। আমি মহাভারতের অর্জুন নই।

তাহলে!

আমি নরসিংদীর ব্রাহ্মণদীর অর্জুন।

তোমার বাবা-মা?

আমার বাবা শ্যামল চট্টোপাধ্যায়। অকালে মারা যায়। আমার ছোটবেলায় মা বিধবা হয়।

ওই অর্জুনের কথিত বাপ পাণ্ডুও অকালে মারা যান। কুন্তী বিধবা হন।

কিছু বললেন? বুঝতে পারছি না।

তোমার বোঝার দরকার নেই। বলো, তোমার মায়ের কথা বলো।

মায়ের নাম অচলা।

তোমার অন্যান্য ভাইবোন?

বোন ছিল না। আমরা পাঁচ ভাই।

পঞ্চপাণ্ডব!

কী বললেন?

ও কিছু না। ভাইদের সম্পর্কে বলো।

আমি তৃতীয়। বড়ো দুই, ছোট দুই।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন। তৃতীয় পাণ্ডব তুমি!

না, আমি কোনো তৃতীয় পাণ্ডবটান্ডব নই।

বড়ো দুই ভাই রঞ্জন আর বিনোদ। বিয়ের পর থেকে আলাদা সংসার তাদের। ছোট দুই ভাইকে নিয়ে আমি আর মা।

বড়ো ভাইয়েরা দেখে না তোমাদের?

ওরা আমাদের কোনো খোঁজখবর নেয় না। আপন সংসারে মশগুল। ঢাকার শাঁখারি বাজারে দোকান করে।

চলত কী করে তোমাদের? মানে খাওয়া-দাওয়া!

মা বাড়ি বাড়ি ধান ভানত। বাসনকোসন মাজা, কাপড়চোপড় ধোওয়া।

তুমি?

ঘরে ঘরে টিউশনি। ছোট ভাই নকুল-সহদেব ইস্কুলে।

নকুল-সহদেব! আবার বিভ্রান্তি!

ছোট দুজনের একজন নকুল, অন্যজন সহদেব।

নিশ্চয়ই তুমি অর্জুন ছাড়া অন্য কেউ নও। আমার অনুমান মিথ্যে হতে পারে না।

আপনার অনুমান মিথ্যে হবে কেন? আমি তো অর্জুনই।

তুমি নরসিংদীর অর্জুন নও। তুমি হস্তিনাপুরের অর্জুন। তিন হাজার বছর পূর্বেকার অর্জুন।

আপনার কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। আমি তিন হাজার বছর আগেকার অর্জুন হতে যাব কেন? আমি তো ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের অর্জুন। বাসের ডলায় মারা গিয়ে সদ্য স্বর্গে এসেছি।

জন্মান্তর হয়েছে তোমার। মহাভারতের অর্জুন নরসিংদীতে অর্জুন হয়ে জন্মেছ।

কী বলছেন এসব!

তুমি জাতিস্মর নও। জাতিস্মর হলে ফেলে-আসা জীবনের সকল কথা মনে পড়ত তোমার।

জাতিস্মর কী, মহাভারতের অর্জুন কে? কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার।

তোমার ওসব ভাবার দরকার নেই। ভাবনাটা আমার। যা বোঝার তাও বুঝে গেছি আমি।

একটা প্রশ্ন করি আপনাকে?

করো।

এতক্ষণ ধরে আপনি আমার নাড়িনক্ষত্র বুঝে নিলেন। এই অধম আপনার পরিচয় জানে না। আপনার নামটা কি একটু বলবেন?

আমার নাম? আমি একলব্য।

কোন একলব্য? মহাভারতের?

হ্যাঁ।

ও! আপনার কথাই তাহলে শশধর স্যার বলতেন। কই দেখি দেখি, আপনার ডান হাতটা দেখি!

ডান হাত দেখে কী করবে?

মিলিয়ে নেব।

কী মিলিয়ে নেবে?

শশধর স্যারের কথা।

কী বলতেন তিনি আমাকে, মানে একলব্যকে নিয়ে?

একটু পাগলাধরনের ছিলেন শশধর স্যার। আমাদের ধর্মক্লাস নিতেন। কথায় কথায় মহাভারতকে টেনে আনতেন। হয়তো পড়াচ্ছেন গণেশ বিষয়ে, টেনে আনলেন একলব্যের প্রসঙ্গ। আউলাঝাউলা চুল, আকামানো দাড়ি। দাঁতও সবসময় মাজতেন কি না সন্দেহ!

তা কী বলতেন তিনি একলব্যকে নিয়ে? প্রশ্নটা আগেও করলাম। উত্তর না দিয়ে দিলে শশধর স্যারের বিবরণ!

আপনার প্রসঙ্গ এলেই রেগে যেতেন খুব। চোখ গোল গোল হয়ে যেত তাঁর! চোখের কোনা থেকে যেন আগুন বেরোচ্ছে!

তা এত রাগ তাঁর কার ওপর?

বালকবেলায় তাঁর কথা তো সব বুঝতাম না! আর্য, অনার্য, ব্যাধ—এসব বলতেন। আর জোরসে গালি দিতেন দ্রোণাচার্যকে।

গালি দিতেন!

সে কী গালি! একেবারে মুখ-আলগা গালিগুলো। তিনি যে ক্লাসে পড়াচ্ছেন, ভুলে যেতেন। ও হ্যাঁ, আরেকটি কথা...।

কী কথা?

বলতে লজ্জা করছে।

সব কথা খুলে না বললে তোমার শশধর স্যারকে বুঝব কী করে?

দ্রোণাচার্যের সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনকে খুব গালমন্দ করতেন স্যার। সেই গালি আমার ওপরও কিছুটা বর্তাত।

কেন, কেন অর্জুনকে গালমন্দ করতেন?

ওই অর্জুনই নাকি নাটের গুরু। দ্রোণাচার্যকে বকাঝকা করে হয়রান হয়ে একটু থামতেন শশধর স্যার। দম নিতেন। তারপর পেয়ে বসতেন অর্জুনকে। দ্রোণাচার্য নাকি আপনার ক্ষতি করতে চাননি। অর্জুনই নাকি আপনার আঙুল কেটে নেওয়ার জন্য দ্রোণাচার্যকে প্ররোচিত এবং বাধ্য করেছে।

আর কী বলতেন তোমার শশধর স্যার?

অর্জুন নাকি ভীষণ স্বার্থপর শিষ্য ছিল। অস্ত্র-পাঠশালা থেকে আপনাকে তাড়িয়ে দেওয়ার পেছনেও নাকি অর্জুনের ইশারা ছিল!

তারপর?

আপনি যখন নিজ চেষ্টায় ধনুর্ধর হয়ে উঠলেন, অর্জুন সহ্য করতে পারল না। কুকুর দিয়ে ফাঁদ বসিয়ে আপনার কুটিরে দ্রোণাচার্যকে টেনে নিয়ে গেল। কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা স্বরে অর্জুন নাকি বলেছিল, আপনি তো আমাকে পুত্রাধিক ভালোবাসেন, আপনি তো চান আমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বোত্তম ধনুর্ধর হই। থামিয়ে দিন, একলব্যকে থামিয়ে দিন।

তারপর?

দ্বিধান্বিত ছিলেন দ্রোণাচার্য। কীভাবে থামাবেন তিনি আপনাকে? আপনি তো কোনো দোষ করেননি! ওই সময় নাকি অর্জুন প্রায় গর্জন করে উঠেছিল—আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আপনি কুরুবংশের বাঁধাশিক্ষক। শুধু আর্যদেরই শিক্ষিত করে তোলার কথা আপনার। এই অনার্য একলব্য যদি প্রতাপী ধনুর্ধর হয়ে ওঠে, আর্যদের সমূহ ক্ষতি হবে। আপনি নিশ্চয়ই অনার্য-উত্থান চান না। ধ্বংস করুন, ধ্বংস করুন এই অনার্য ব্যাধ একলব্যকে।

তারপর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন গুরুদেব। তাঁরই মৃন্ময় মূর্তির সামনে আমি অস্ত্রসাধনা করেছি। তাই তিনি আমার গুরুদেব আর আমি তাঁর শিষ্য।

শশধর স্যার বলতেন, ওটাই আপনার সবচাইতে বড়ো দুর্বলতা।

কোনটা?

ওই যে দ্রোণাচার্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করা!

করব না! তিনি যে আমার গুরু!

না, তিনি আপনার গুরু ছিলেন না। না শিক্ষাগুরু, না দীক্ষাগুরু। আপনার দুর্বলতা দ্রোণাচার্য বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তো তিনি...!

আমার ডান হাতের বৃদ্ধাঙুলটি যাচঞা করেছিলেন।

আর আপনি খচ করে আঙুলটা কেটে রাখলেন গুরুর চরণের কাছে। কী মাথা নিচু করছেন কেন? ভুল করেননি আপনি? শিষ্য না হয়ে গুরুদক্ষিণা দিলেন!

দ্রোণাচার্য চাইলেন যে!

উনি চাইলেন বলে আপনি দিয়ে দিলেন! ওরকম সততাহীন শিক্ষকের অন্যায় চাওয়া পূরণ করলেন আপনি? কী, কিছু বলছেন না যে!

কী বলব আমি! দ্রোণাচার্য ছিলেন আমার ধ্যানজ্ঞান। তিনি আমার স্বর্গ ছিলেন। মাতৃভূমির মতো মর্যাদা দিতাম আমি ওঁকে।

আর ওই মানুষটিই আপনাকে চিরতরে অকেজো করে দিয়ে গেলেন! তিনি জানতেন, তীর চালনার জন্য ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি কত জরুরি। আপনাকে প্রাণে মারলেন না তিনি, কিন্তু আপনার স্বপ্ন, আপনার সারাজীবনের বাসনার পরিসমাপ্তি ঘটালেন। পরে তাঁর ওপর রাগ হতো না আপনার?

হতো। সবচাইতে বেশি রাগ হতে অর্জুনের ওপর। প্রতিজ্ঞা করেছি—অর্জুনকে আমি প্রাণে মারব।

মারতে পেরেছিলেন?

না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম আমি।

ওই যুদ্ধ আঠারো দিন চলেছিল। নারী এবং ভূমি নিয়ে কুরু আর পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ বেধেছিল।

অর্জুনকে মারব বলে কুরুদের দলে ভিড়েছিলাম।

ওই দলে তো দ্রোণাচার্য ছিলেন!

তখন আমার কাছে দ্রোণাচার্য গৌণ। অর্জুনই আমার প্রধান শত্রু।

বাগে পেয়েছিলেন কি অর্জুনকে?

না। অর্জুন কাপুরুষ। আমার সামনে থেকে সে দূরে দূরে থেকেছে। আচমকা আমি তার সামনে উদয় হলে তার সারথি কৃষ্ণ অর্জুনের রথটি পলকে সরিয়ে নিয়েছেন। মারতে পারিনি আমি তাকে।

আপনাকে তো পালাতে হয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে!

ঠিক বলেছ তুমি। দুর্যোধনের পতন হলে সসৈন্যে হস্তিনাপুর থেকে সরে এসেছি আমি।

অর্জুন প্রাণে বেঁচে গেছে।

হ্যাঁ, প্রাণে বেঁচে গেছে ওই সময়। কিন্তু আসলেই কি সে বাঁচতে পেরেছে?

বাঁচেনি! বেঁচেছে তো!

বাঁচলে কী তোমার এই দশা হয়!

কোন দশা! ও, আমার ডান হাতের কথা বলছেন?

তোমার ডান হাতটা নেই কেন?

তার আগে বলুন আপনার অন্যান্য বিবরণ। মানে আপনার মা-বাবা, রাজ্য, বড়ো হয়ে ওঠা এসবের কথা বলুন।

আমার বাবা হিরণ্যধনু। অরণ্য মধ্যে বিশাল তাঁর রাজ্য। শবর, ব্যাধরা তাঁর প্রজা। বড়ো ভালোবাসত প্রজারা তাঁকে। আমারও জীবন চলছিল সুখে। দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে ধনুর্বিদ্যা গ্রহণের বাসনা জাগল মনে। ওটাই আমার জীবনের কাল হলো। আঙুল হারালাম। মহাভারতে ব্যাসদেব আমার পরিচয় দিতে গিয়ে শুধু বাপের নামটি লিখেছেন। মায়ের নামটিকে অবহেলা করেছেন। অথচ তিনি নিজে মাকে সম্মান জানিয়ে গেছেন। ধর্ষক পিতা পরাশরকে তাঁর মহাকাব্যে তেমন গুরুত্ব দেননি। কিন্তু আমার মায়ের পরিচয়ের বেলায় অবহেলার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। আমার মা বিশাখা আমায় ভীষণ ভালোবাসতেন।

এখন বলি আমার কথা, আমার ডান হাত হারানোর কথা।

বলো।

বড়ো দুই ভাই আমাদের অগ্রাহ্য করল। একই ভিটার এধারে-ওধারে থাকি। আমরা কোনো বেলায় খাই, কোনো বেলায় খাবার জোটে না। একদিন মা গঞ্জের বাজার থেকে একটা বাঙ্গি আনল। দুবেলা উপোসি আমরা গোগ্রাসে খেলাম ওই বাঙ্গি। পচা ছিল বোধহয়। মায়ের পেটে সহ্য হলো না। ওই রাতের ভেদবমিতে মারা গেল মা।

মারা গেলেন!

পরদিন সকালে বড়ো ভাই দুজন বউ নিয়ে উঁকি দিতে এসেছিল। মায়াকান্না করল কিছুক্ষণ। উঠানে মানুষের ভিড় বাড়লে সটকে পড়ল।

কেন, সটকে পড়ল কেন?

শ্মশানের খরচ দিতে হয় যদি!

তারপর কী হলো?

পড়শিরা চাঁদা তুলে মায়ের দাহকার্য সারল। নিশ্চয়ই আপনি জিজ্ঞেস করবেন পরে কী হলো?

তাই তো জিজ্ঞেস করব।

ততদিনে আমি এসএসসি পাস করে ফেলেছি।

এসএসসি মানে কী?

ও আপনি বুঝবেন না। পুরানো দিনের মানুষ আপনি। এসএসসি লেখাপড়ার একটা স্তর, প্রাথমিক স্তরও বলতে পারেন। এটা পাস করলে কলেজে ভর্তি হওয়া যায়।

তুমি তোমার দুই ছোট ভাইকে নিয়ে গ্রামে থেকে গেলে!

থেকে যেতাম, যদি খাবার জুটত। গাঁয়ে আমাদের খাবার জুটল না। ভাইদের নিয়ে আমি ঢাকায় চলে গেলাম।

ঢাকা কী?

ঢাকা আমাদের দেশের রাজধানী।

কেন গেলে?

ঢাকায় খাবার জুটবে, এই আশায়। তাছাড়া...।

তাছাড়া কী?

ঢাকা শহরে আমার দূরসম্পর্কের এক পিসি থাকত। ওর কাছে আশ্রয় মিলবে বলে ঢাকায় ছুটে গিয়েছিলাম।

আশ্রয় জুটেছিল, তোমাদের?

নিতান্ত দরিদ্রঘরে বিয়ে হয়েছিল পিসির। আমাদের আশ্রয় দেওয়ার মতো ক্ষমতা তার ছিল না। একেবারে দূর দূর করেনি আমাদের। সপ্তাহখানেক খেতে থাকতে দিয়েছিল।

তারপর?

পরে কোথায় কোথায় ধরাধরি করে নকুল-সহদেবকে প্রবর্তক অনাথ আশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল পিসি। আমাকে বলেছিল, তুই বাপ কোনো একটা কামকাজ জোটাতে পারিস কি না দেখ।

জোটাতে পেরেছিলে, কাজ?

ঢাকা একটা নিষ্ঠুর শহর। এই ঢাকা নেয়, দেয় না। শরীরের রক্ত-ঘাম চুষে নেবে, বিনিময়ে আখের ছোবড়ার মতো ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

তোমাকেও ছুঁড়ে ফেলেছিল বুঝি!

একেবারে ছুঁড়ে ফেলতে পারেনি। টিউশনি করার অভ্যাস তো আগে থেকেই ছিল! শুরু করলাম টিউশনি। বাসায় বাসায়। পিসিকে খোরাকি দিই, পিসি তার বারান্দার এক কোণে মাথা গোঁজার ঠাঁইটি দিয়েছে আমায়। তার ঘরভর্তি ছেলেমেয়ে-নাতি-নাতনি। এই সময় একটা কাণ্ড করে বসলাম আমি।

কী কাণ্ড করে বসলে?

ঢাকা সিটি কলেজে আইএ-তে ভর্তি হয়ে গেলাম।

মানে আরও বেশি পড়তে চাইলে তুমি।

পিসি বলল, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে চাইলে তোমাকে আরও পড়তে হবে অর্জুন।

ঠিকই বলেছেন তিনি।

আইএ পাস করলাম। বিএ-তে ভর্তি হলাম।

নকুল-সহদেবদের সঙ্গে যোগাযোগ?

সপ্তাহে দুই-তিন দিন তাদের দেখতে যাই আমি। কিছু ফলমূল ও মিষ্টি নিয়ে যাই। তাদের বলি—ভাইয়েরা, আমাদের বড়ো হতে হবে অনেক। তোরা ভালোমতো পড়াশোনা কর। তো একদিন তাদের দেখে পিসির বাসায় ফেরার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটল।

কী দুর্ঘটনা! কোন দুর্ঘটনার কথা বলছ তুমি?

পিসির শরীরটা খারাপের দিকে। পিসি বলেছিল, তাড়াতাড়ি ফিরিস বাবা। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। মায়ের বদলে পিসিকে আঁকড়ে ধরেছিলাম আমি। মনটা বড়ো উচাটন ছিল সেইবেলা। লাফিয়ে বাসে উঠেছিলাম। ভিড়ের কারণে গাড়ির ভিতরে ঢুকতে পারিনি। পা-দানিতেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। ডান হাত আর অর্ধেক শরীর বাসের বাইরে ছিল।

তারপর?

আচমকা আমাদের বাসটির গা একেবারে ঘেঁষে আরেকটি বাস এগিয়ে গেল। আমার পাশের সবাই হই চই করে উঠল। ওরা আমার দিকে কী যেন দেখাচ্ছে। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি হঠাৎ ডান দিকে ফিরলাম। দেখি আমার ডান হাতটি নেই। এগিয়ে যাওয়া বাসটির গায়ে লেগে আছে। দরজায় লাগানো কার্টুনের মতো লেপটে আছে।

তারপর!

তারপর আমার কিছুই মনে নেই। হাসপাতালে একবার বুঝি হুঁশ এসেছিল। চারদিকে মানুষজন। তীব্র আলো। আবার চোখ বুজেছিলাম।

তারপর?

তারপর আমার চেতনা ফিরল একদিন। তখন আমি দাঁড়িয়ে। আমার সামনে বিকটাকার একজন মানুষ। আশপাশে গুঞ্জন উঠল—যমরাজ যমরাজ বলে। পরে জানলাম, তিনিই আমাদের পাপ-পুণ্যের বিচারক। পাশের চিত্রগুপ্তের সঙ্গে নিচু স্বরে কিছুক্ষণ কথা বললেন। তারপর আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, যাও তোমার কোনো পাপ নেই। যমদূতদের ইশারা করে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, ওকে স্বর্গে নিয়ে যাও।

তোমাকে দেখে আমি প্রথমে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। আঙুল হারিয়ে আমি যে কষ্টটা পেয়েছি, হাত হারিয়ে তুমি আমার চেয়ে বহুগুণ বেশি কষ্ট পেয়েছ। তারপর তোমার নামটি যখন জানলাম...।

খুশি হলেন। প্রচণ্ড খুশি হলেন। ভাবলেন—আমিই বুঝি মহাভারতের অর্জুন। যে অর্জুন চাতুরির আশ্রয় নিয়ে দ্রোণাচার্যকে দিয়ে আপনার বুড়ো আঙুলটি কেটে নিয়েছিল।

তুমি ঠিকই বলছ ভাই। খুশি হয়েছিলাম খুব। ভেবেছিলাম—আঙুলের পরিবর্তে হাত। বিধাতা গোটা ডান হাতটিই কেড়ে নিয়েছেন তোমার! এতে আমার উল্লসিত হওয়ারই তো কথা! কিন্তু...। কিন্তু পরে যখন বুঝলাম, তুমি কুন্তীপুত্র অর্জুন নও, ভেতরে দুমড়েমুচড়ে যেতে লাগল আমার।

দেখুন আপনি একটু আগে বিধাতা আমার হাত কেড়ে নিয়েছেন বললেন। এই কথার মধ্যে ভুল আছে।

কী ভুল! বিধাতা নেননি।

না। ঢাকায় বিধাতার কোনো হাত নেই। এখানে যা কিছু কর্ম-অপকর্ম হয়, সবই মানুষের হাত দিয়েই হয়। এই শহরের কোনো বিধাতা নেই। এই শহরে আছে বেপরোয়া কিছু মানুষ। ওরাই ঠিক করে অন্য সাধারণ মানুষের ভাগ্য। কে বাঁচবে, আর কে মরবে, কে ভিখারি হবে, আর কে হবে কোটিপতি, সবই নির্ধারিত হয় ওই সব দুর্দমনীয় মানুষদের দ্বারা। কাকে বেধড়ক পিটাবে আর কাকে মাথায় তুলে নাচবে—ওটা ওদেরই হাতে। এখানে যানচালকরা কোনো শাস্তি পায় না, খুনিরা দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ঋণখেলাপিদের ধনের পাহাড় বড়ো হতে থাকে।

অর্জুন, তোমার অনেক কথাই আমি বুঝতে পারছি না। তবে এইটুকু বুঝেছি, তোমার হত্যাকারী বাসচালকের কোনো শাস্তি হয়নি। ওই গভীর বেদনা নিয়েই তুমি মর্ত্যলোক ছেড়েছ।

শাস্তি হয়নি বললে ভুল হবে। চালকটিকে ধরা হয়েছে। জানি না তার বিচার হবে কি না। বিচার তো হয় না। কালেভদ্রে কারও হলেও অধিকাংশই ছাড়া কারও পেয়ে যায়। জানি, আমার ঘাতকও ছাড়া পাবে।

ঠিকই বলেছ তুমি, বিচার হবে না। বিচার হয়নি কোনো কালে। আমার কথাই ভাবো, দ্রোণাচার্য আর অর্জুন মিলে এই যে আমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা কেড়ে নিল। তার কী বিচার হয়েছে? ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, কুন্তী, দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র—এঁরা সবাই শুনেছেন এই অন্যায়ের কথা। কিন্তু তাঁরা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের দৃশ্য দেখার মতো নিশ্চুপ থেকেছেন। কেন থেকেছেন জানো?

কেন?

আমি যে অনার্য ব্যাধ!

আমি তো অনার্য ছিলাম না!

ছিলে তো! দরিদ্ররা যে অনার্য ব্যাধেরও অধম!

দেউলিয়া

ইন্দ্র দেবতা। স্বর্গের রাজা।

দেবতারা ইন্দ্রের অধীন। ইন্দ্র স্বেচ্ছাচারী। স্বেচ্ছাচারীরা ভোগী হয়। ভোগীরা লম্পট। কামুক তারা। ইন্দ্র যেমন ভোগী, তেমনি কামুক। নিজ প্রাসাদে প্রচুর রমণী। তারা অপরূপ সুন্দরী। তাদের অঙ্গগঠন মনোলোভা, কটাক্ষ বিমোহন, উন্নত কুচযুগল, পুরুষ্টু ওষ্ঠাধর। তারা ইন্দ্রের সহজলভ্যা। এমন কি ইন্দ্রের স্ত্রী যে শচী, অসাধারণ রূপময়ী। শচীর সারা অঙ্গে লাবণ্যের ছটা। এসবে কোনো আগ্রহ নেই ইন্দ্রের। ওরা যে সহজপ্রাপ্যা, ওদের শরীরের ভাঁজ-বাঁক যে ইন্দ্রের জানা হয়ে গেছে! জ্ঞাত, স্পর্শিত, সম্ভোগকৃত কোনো রমণীর প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই! ওইসব নারী তার কাছে আবর্জনা। তার চাই নতুন নতুন নারী, তার চাই সম্ভোগযোগ্যা লোভনীয় দেহের ভরাযৌবনের নারী।

ইন্দ্রের দেহরঙ পিঙ্গল। তার হাত দুটি দীর্ঘ। সেই হাতে বজ্র—অমোঘ এবং প্রাণঘাতী। ভুবনবিখ্যাত তীরন্দাজ সে। তার ভয়ে সসাগরা ভূমণ্ডল কাঁপে। ওতে সুখ নেই ইন্দ্রের। তার যত সুখ ও স্বস্তি নারীদেহে। পরনারীতে তার তীব্র আকর্ষণ। ছলে-কৌশলে অপরের কুলনারীকে তার অঙ্কশায়িনী করা চাই-ই চাই।

এজন্য ইন্দ্রকে যে মাশুল গুনতে হয়নি, এমন নয়। কিলগুঁতা তো খেয়েছে খেয়েছেই, ধরা পড়ে বড় ধরনের শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছে ইন্দ্রকে। তাতেও তার কামুকতা কমেনি। বরঞ্চ উত্তরোত্তর বেড়েছে। তার বিশাল শরীরটা যেন রিরংসার আধার। তীব্র রমণেচ্ছার তাড়নায় মর্ত্যে ঘুরে বেড়ায় ইন্দ্র। সুযোগ বুঝে শিকারে মত্ত হয়।

কামাস্থির ইন্দ্র একদিন গহিন অরণ্যে ঘুরছিল। যদি কোনো শিকার্য পাওয়া যায়! ঘুরতে ঘুরতে ঋষি গৌতমের পর্ণকুটিরে উপস্থিত হলো ইন্দ্র। ওই সময় ঋষি গৌতম কুটিরে উপস্থিত ছিলেন না।

ঋষির স্ত্রী অহল্যা ইন্দ্রের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। এমন রূপলাবণ্যেভরা নারী! এই পাতার ঘরে! এরকম জীর্ণ-দীণ অবস্থায়! মাথা ঘুরে গেল ইন্দ্রের।

কামাবেগ তাকে অস্থির করে তুলল। একটা ফন্দি আঁটলো ইন্দ্র। ধীর পায়ে কুটিরের দিকে এগিয়ে গেল। অহল্যা তখন পেছনফিরে প্রাঙ্গণের শিশুবৃক্ষে জলসিঞ্চনে মগ্ন।

উঠানে দাঁড়িয়ে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'একপাত্র জল পাবো? তৃষ্ণা নিবারণের জন্য।'

চকিতে ইন্দ্রের দিকে ফিরল অহল্যা। চমকে উঠল। তার এ চমকানো, ইন্দ্রের শরীরগঠনের জন্য। এমন পেশিবহুল দৃষ্টিনন্দন দেহ! এমন সুসজ্জিত অঙ্গভূষণ! দীর্ঘ শরীরের ভাঁজে ভাঁজে যেন যৌবন সুপ্ত হয়ে আছে! আহা, এরকম দেহ কতদিন দেখেনি অহল্যা! শীর্ণকায় জটাজুটধারী, কৌপীন পরিহিত গৌতমকে দেখে দেখে চোখ দুটো মরে গেছে অহল্যার।

তার স্বামী ঋষি গৌতম তেজোদীপ্ত, কিন্তু বীর্যবান নন। স্ত্রীরা চায় মর্দন, চায় সোহাগ। চায় স্বামীরা তাদের উদ্দীপিত করুক, দলিত-মথিত করুক, রমণে ভাসিয়ে দিক। কিন্তু এগুলোর ধারে-কাছে নেই গৌতম। তিনি মনে করেন, অহল্যা তার প্রস্ফুটিত কুসুম। তাকে স্পর্শ করা ঠিক নয়, তাতে তার সৌরভ নষ্ট হয়ে যাবে, তার দেহঘ্রাণ ম্লান হয়ে যাবে। তাই দূরে দাঁড়িয়ে তিনি অহল্যার দেহরূপ উপভোগ করেন। কিন্তু অহল্যা চায় দেহলগ্নতা, চায় উষ্ণ স্রোতের উজ্জ্বল অনুভব।

দীর্ঘদিনের ক্ষুধার্ত অহল্যা। ইন্দ্রকে দেখে তার দেহক্ষুধা সুতীব্র হলো। পাত্রভরা জল এগিয়ে দেওয়ার সময় অপাঙ্গে তাকাল ইন্দ্রের দিকে।

ইন্দ্রের বুঝতে অসুবিধা হলো না যে অহল্যার কটাক্ষে দেহসুখের তীব্র বাসনা লুকিয়ে আছে।

জলপাত্র নেওয়ার সময় অহল্যার আঙুল ছুঁয়ে দিল ইন্দ্র। অহল্যা তড়িৎ-স্পর্শিত হলো। শিহরিত হলো ইন্দ্র।

জলপান শেষ করে ইন্দ্র তৃপ্তির একটা শ্বাস ফেলল। বলল, 'আপনি একা থাকেন বুঝি, এখানে?'

অহল্যা কটাক্ষবাণ ছুড়ে বলল, 'একা থাকলে সুবিধা বুঝি!'

ইন্দ্র অহল্যার কথা ধরতে পারল না। বলল, 'কিছু বলছিলেন?'

অহল্যা হাসতে হাসতে বলল, 'না, আমি একা থাকি না। আমার একজন পাহারাদার আছে। সে গৌতম। ঋষি গৌতম আমার স্বামী।'

গৌতমের নাম শুনে ইন্দ্র গুটিয়ে গেল। ভাবল—এখানে তার কামনা চরিতার্থ হওয়ার নয়। যার স্বামী ঘরে, সে তো কখনো তৃপ্ত না থেকে পারে না!

'না, আমি তৃপ্ত নই।' অহল্যা আচমকা বলে উঠল।

চমকে অহল্যার দিকে তাকাল ইন্দ্র। কী আশ্চর্য, মনের কথা বুঝল কী করে রমণীটি! সে তো শব্দ করে কিছু বলেনি!

ভ্যাবাচেকা চোখে অহল্যার দিকে তাকিয়ে কী একটা বলতে চাইল ইন্দ্র।

এই সময় অহল্যা বলে উঠল, 'আমার নাম অহল্যা। আচ্ছা অহল্যা অর্থ জানো তুমি?'

ইন্দ্র আমতা আমতা করে বলল, "হল, শব্দের অর্থ তো কদর্যতা।"

'আর অহল্যা মানে?' জানতে চাইল অহল্যা।

একটু থতমত খেয়ে চুপ করে থাকল ইন্দ্র।

অহল্যা বলল, 'সকল প্রকার কদর্যতাশূন্য যে নারী, সে-ই অহল্যা। সে আমি।'

অহল্যার কথায় একেবারে তটস্থ হয়ে গেল ইন্দ্র। তার বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, অহল্যা স্পষ্টত তাকে ধমক দিচ্ছে। বলছে—আমি সহজলভ্যা নই। কেউ ইচ্ছে করলেই তার কামাগ্নির হোম-হওয়া নারী আমি নই। তুমি হাত বাড়াতে চাইছ আমার দিকে, ও হাত যে ভস্ম হয়ে যাবে ইন্দ্র!

অহল্যা বলে উঠল, 'আমার স্বামী গৌতম সুপুরুষ। দৃষ্টিনন্দন তার অঙ্গসৌষ্ঠব। নারীর কামনাপূরণের সকল শক্তি তার দেহে বর্তমান।'

একথা যে মিথ্যেয় ভরা, এই কথাগুলো যে চাতুরিতে পূর্ণ, ইন্দ্রকে বুঝতে দিল না অহল্যা।

'কিন্তু একটুক্ষণ আগে আপনি যে বললেন, আপনি তৃপ্ত নন!' ইতস্তত কণ্ঠে বলল ইন্দ্র।

'ও কথায় তো মিথ্যে নেই!'

'তাহলে!'

'তাহলে কী?' খল খল কণ্ঠে হেসে উঠল অহল্যা।

অহল্যার এই খলবলানি হাসি শুনে হঠাৎ আরেকজনের কথা মনে পড়ে গেল ইন্দ্রের। সে লৌহিতা।

লৌহিতা শবরপল্লির মেয়ে। এরকম করেই হেসে উঠেছিল লৌহিতা, ইন্দ্রের সামনে। তবে ঠিক অহল্যার মতো করে নয়। লৌহিতার হাসিতে ছিল নুড়ির ওপর দিয়ে বয়ে-যাওয়া ছোট্ট ঝরনার মৃদু সুরধ্বনি। তবে লৌহিতার সেই মৃদু লয়ের হাসি মুহূর্তেই খরতর হয়ে উঠেছিল।

গৌরবর্ণী নারীদের ভোগ করতে করতে একসময় ইন্দ্রের মনে বিতৃষ্ণা জেগে উঠেছিল। সেই প্রমত্তা ভরাযৌবনের উর্বশী, সেই চোখধাঁধানো রূপের মেনকা বা সেই মাতালকরা দেহাধিকারী দেবকন্যারা! ভাল্লাগে না এদের! তখন ইন্দ্রের খুব রুচি বদল করতে ইচ্ছে করল। স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে নেমে এলো সে। এবার তার গন্তব্য কোনো তপাশ্রম নয় বা আলোক-উজ্জ্বল কোনো রাজধানীর নয়নাভিরাম বাগানবাড়িও নয়। সেখানে কালো মেয়ে কোথায় যে সেসব জায়গায় যাবে! সে জানে, কোনো ইতরপল্লিতে গেলে কালোবরণ কন্যা মিলবে। ব্যাধপল্লিগুলোই কৃষ্ণাদের আবাসস্থল। মগধরাজ্যে নগরের বাইরে একটি শবরপল্লি আছে, এ ইন্দ্রের জানা।

ইন্দ্র সেই শবরপল্লিতে উপস্থিত হলো। পল্লির ঘরগুলো ছড়ানো-ছিটানো। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে এক একটি ঘর। পল্লির পুরুষেরা দিনের বেলায় মৃগয়ায় যায়। দূর-দূরান্তের অরণ্যে ওরা তীর-ধনুক-টেঁটা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। দিনশেষে কাঁধে ধৃত বা নিহত পশু ঝুলিয়ে বাড়ি ফেরে। ওই সময় শবরনারীরা সন্তনাদি লালন করে, গৃহস্থালি দেখভাল করে।

এই শবরপল্লির একজন ভল্ল। পাথর ছেনে বানানো শরীর তার। পেশিবহুল। সেই পেশিতে সমুদ্রের ঢেউ আটকানো। একমাথা ঝাঁকড়া চুল। আবলুস কাঠের মতো দেহরঙ। লৌহিতা ভল্লের বউ। তার ত্বকে অমাবস্যার অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। শ্রাবণের মেঘের মতন চুল তার। তার কালো দেহের বাঁকে বাঁকে আহ্বান—আয় আয়। কালো দেহেতেও যে পুরুষকে বিবশ করার সৌরভ থাকে, তার উদাহরণ লৌহিতা।

লৌহিতা আর ভল্লের মধ্যে গভীর ভালোবাসাবাসি। শিকারে বেরোবার আগে ভল্ল বলে, 'সারাদিনমান মোরে না দেখ্যা তোহার ভাল লাইগবেরে লৌহিতা?'

লৌহিতা গাল ফুলিয়ে বলে, 'হ, ভাল লাইগবেক।'

'কী!' অভিমানছলে বলে ওঠে ভল্ল।

লৌহিতা ভল্লের গা ঘেঁষে ভল্লের দু'হাত ছুঁয়ে বলে, 'জলদি ফির‍্যা আসিস তুই। তোহার লাগি আমি পথ চাইয়া রব।'

খুশিতে ভল্লের মন ভরে ওঠে। তার সদ্যবিবাহিত বউটি তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে! শিহরিত হয় সে। হঠাৎ লৌহিতাকে জাপটে ধরে ভল্ল। গায়ে-গলায় মুখ ঘষতে ঘষতে বলে, 'অ আমার জলভরা কলস রে, অ আমার দুধাল গাই রে!'

এই ভল্লের উঠানে এসে দাঁড়িয়েছিল ইন্দ্র। ভল্ল তখন শিকারে, লৌহিতা বিছানায়, অলস অবকাশে।

ডাক দিয়েছিল ইন্দ্র, 'কেউ আছে, ঘরে কেউ আছে?'

বিজাতীয় কণ্ঠস্বর শুনে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেছিল লৌহিতা। ওই অবস্থাতেই উঠানে বেরিয়ে এসেছিল সে। নিম্নাঙ্গে স্বল্পবস্ত্র। স্তন দুটো এক টুকরা কাপড় দিয়ে বাঁধা। বস্ত্রবন্ধন থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য কুচযুগল ছটফট করছে। টানা চোখ দুটোর ওপর বাঁকানো ধনুকের মতো ভ্রু।

মুহূর্তেই মাথা ঘুরে গেল ইন্দ্রের। এত সৌন্দর্য এই কৃষ্ণবর্ণ দেহে! এত ঢেউ বস্ত্রবদ্ধ স্তনযুগলে! আহা!

ইন্দ্রের দেহ আলুলায়িত হয়ে উঠল। পলকহীন চোখে লৌহিতার দিকে তাকিয়ে থাকল ইন্দ্র। এই সময়, ঠিক এইসময় প্রবল প্রতাপশালী একটি উষ্ণ প্রবাহ শির থেকে শিরদাঁড়া বেয়ে শিশ্ন পর্যন্ত বয়ে গেল তার।

বিহ্বল অবস্থায় ইন্দ্র বলল, 'জল খাব।'

লৌহিতা থতমত খেয়ে গেল। রাজবাড়ির লোক তাদের মতো ছোটজাতের ঘরে জল খাবে!

বলল, 'পানি খাবি তু! মোর হাতের পানি খাবি!'

ইন্দ্র উপরে-নিচে মাথা নাড়ল।

লৌহিতা দ্রুত ঘরের ভেতর গেল। মাটির ঘটিতে করে পানি নিয়ে এলো। ঘটিটি লৌহিতার হাত থেকে নেওয়ার সময় হাতটিই আঁকড়ে ধরল ইন্দ্র!

গাঢ় কণ্ঠে বলল, 'তুমি আমার আপনজন। তোমার হাতের জল খেতে আমার আপত্তি কেন থাকবে।' বলে নিজের দিকে লৌহিতাকে সজোরে টেনে নিল।

ঠিক ওই সময় মর্মান্তিক হাসিটা হেসে উঠেছিল লৌহিতা—ছলছল, কলকল, ঝরনাধারার চলনধ্বনির মতো।

এই হাসিটা না হেসে লৌহিতার কোনো উপায় ছিল না। সে বুঝতে পেরেছিল—এই শুয়ারটা তাকে নষ্ট না করে ছাড়বে না। ওকে প্রতিহত করতো যে ভল্ল, সে-ও নেই ঘরে। আর তার শরীরে তো এমন বল নেই যে, ওকে এক ঠেলায় সরিয়ে দেয়! তাই তার এই হাসি!

লৌহিতা হাসতে হাসতে বলল, 'আমার শরীর লিতে চাস তুই? গতর লইয়া খেইলতি চাস?'

ইন্দ্র জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

লৌহিতা বলল, 'তাহলে তুকে একটুখান খাড়াতে হইবে। মরদ আমার যাওয়ার সময় বিছানাটা এলে-ঝেলে কইরে গেছে। ওটা এট্টু ঝেইড়ে আসি?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে! বিছানাটা ঝেড়ে আসো তুমি। আমি অপেক্ষা করছি। তোমাকে রাজরানি করব আমি।'

লৌহিতা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'হ অপেক্ষা কইরে থাক, নাগর আমার।' বলে দ্রুত ঘরের ভেতর ঢুকে গেল।

পলকেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো লৌহিতা। হাতে তীক্ষ্ণমুখ কাটারি। রোদ পড়ে সেই কাটারি চিক চিক করে উঠল।

ইন্দ্রের দিকে দৌড়ে আসতে আসতে লৌহিতা চিৎকার করে বলল, 'গতর লিবি মোর? খেইলবি আমার লগে! মোরে পাটে বসাবি শুয়ার! খাড়া, আমি তুর লিঙ্গ কাটি লই।'

লৌহিতার হন্তারকমূর্তি দেখে আঁতকে উঠল ইন্দ্র। দ্রুত পেছন ফিরল। পড়ি কি মরি করে দৌড় লাগাল। ওই সময়েই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল।

দৌড়াতে গিয়ে পা হড়কে গেল ইন্দ্রের। পাহাড়ি ঢালু পথ। এবড়ো-খেবড়ো। গড়াতে গড়াতে বহু নিচ পর্যন্ত চলে এলো ইন্দ্রের দেহটা।

ক্ষত সারাবার জন্য দীর্ঘদিন রাজবদ্যির অধীনে থাকতে হয়েছিল ইন্দ্রকে। পা হড়কে যাওয়ার আগমুহূর্তে লৌহিতার কর্কশ কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিল ইন্দ্র, 'ও-সব সস্তা মাইয়া মানুষ তোহাদের রাজবাড়িতে আছে রে শেয়ালের ছা। ইখানে সব নারী সতী আছে।'

তারপর লৌহিতার কণ্ঠের সেই ঝিকিমিকি হাসির শব্দ ভেসে এসেছিল।

আজ ওই লৌহিতা-ঘটনার বহুদিন পরে, ঋষি গৌতমের উঠানে দাঁড়িয়ে, ওইদিনের ঘটনাটা মনে পড়ে গিয়েছিল ইন্দ্রের। অহল্যার খলখল হাসিতে লৌহিতার মুখটি ইন্দ্রের চোখে ভেসে উঠেছিল।

'তাহলে কী'—অহল্যার এই রহস্যময় কথার কী উত্তর দেবে, ঠিক করতে পারছিল না ইন্দ্র।

ইন্দ্রকে চমকে দিয়ে অহল্যা বলে উঠল, 'আগে আমাকে তুমি করে বলো দেবরাজ। তারপর না হয় তোমার কথার উত্তর দেব আমি!'

'দেবরাজ!' ইন্দ্রের বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

'তুমি ইন্দ্র নও, বলতে চাইছ নাকি!'

'না বলছিলাম কী, তুমি আমাকে চিনলে কী করে! অরণ্যবাসী একজন ঋষির পত্নী হয়ে স্বর্গরাজকে চেনার তো কথা নয়!'

'আচ্ছা সূর্যকে কি কেউ চিনিয়ে দেয়—উনি দিননাথ?'

'না। সূর্যদেবকে তো চেনাতে হয় না। তিনি নিজের আলোতে উজ্জ্বল।'

'ইন্দ্রেরও নিজস্ব আলো আছে। সেই রূপালোক চিনিয়ে দেয়, তুমি দেবরাজ ইন্দ্র। আমি তোমাকে চিনি দেবরাজ।'

'চেন! কী করে!' অবাক চোখে তাকিয়ে বলে ইন্দ্র।

'সেই বৃত্তান্ত না হয় আজ থাক। বলো, কেন এসেছ আমার আঙিনায়।' কণ্ঠে মদিরা ঢেলে জিজ্ঞেস করে অহল্যা।

ইন্দ্র বলে, 'আমি তোমাকে চাই অহল্যা। তোমার রূপযৌবনে ডুব দিতে চাই।'

ইন্দ্রের কথায় রিরংসা-স্পর্শিত হলো অহল্যা। দীর্ঘদিন স্বামী-সংসর্গ থেকে বঞ্চিত অহল্যা। পঠনে-অধ্যাপনায় সময় কাটিয়েছেন গৌতম। স্ত্রীর চাহিদা হেলায় ঠেলেছেন। ইন্দ্রের প্রার্থনায় অহল্যার দেহ জেগে উঠল অকস্মাৎ। তার দীর্ঘদিনের দেহক্ষুধা চাগিয়ে উঠল। তার পরও নারী তো সে! সহজে ধরা দিতে চাইল না অহল্যা।

বলল, 'গৌতম গেছে অদূরের সরোবরে। অবগাহনে। শিগগির ফিরে আসবে। তুমি ফিরে যাও দেবরাজ।'

'আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো না লাবণ্যে। তোমার সরোবরে আমাকে অবগাহনের সুযোগ দাও।'

'গৌতম রাগী ঋষি। ধরা পড়লে অভিশপ্ত হবে।'

'তার আগেই অবগাহন সম্পন্ন করব আমি। তোমার পায়ে পড়ি, বঞ্চিত করো না আমায়।'

ইন্দ্রের মিষ্ট কথায় অহল্যা ভুলল। ইন্দ্রের হাত ধরল।

চঞ্চলপায়ে গৃহাভ্যন্তরে গেল দুজনে।

কামার্ত দুজনে রমণে লিপ্ত হলো।

ঋষি গৌতম অবগাহনশেষে ফিরে দেখলেন, পর্ণকুটিরের দরজা আধো ভেজানো। কপাট খুলে দেখলেন, অহল্যা ইন্দ্রের কামনা পরিতৃপ্ত করছে।

ক্রুদ্ধ গৌতম ইন্দ্রকে অভিশাপ দেন, 'তোর অণ্ড খসে পড়ুক। তোর সমস্ত শরীর জুড়ে সহস্র ভগচিহ্নের উদয় হোক।'

পায়ে আছড়ে পড়ল ইন্দ্র, 'ক্ষমা করুন ঋষি, ক্ষমা করুন। সারা দেহে এই নারীচিহ্ন নিয়ে আমি দেবতাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াব কী করে! স্বর্গসিংহাসনে বসব কী করে! ক্ষমা করুন প্রভু, ক্ষমা করুন।'

ইন্দ্রের অনুনয়-বিনয়ে ঋষি গৌতম ওই ভগচিহ্নগুলো লোচনচিহ্নে রূপান্তরিত করলেন। সেদিন থেকে ইন্দ্রের আরেক নাম হলো—নেত্রযোনী।

এবার অহল্যার দিকে মুখ ঘোরান গৌতম।

রোষমাখা কণ্ঠে বলেন, 'তুমি কামুক অহল্যা, স্বৈরিণী তুমি। তুমি স্ত্রী-কর্তব্য ভুলে পরপুরুষে দেহ দিয়েছ। তুমিও শাস্তিযোগ্যা।'

ইন্দ্রের মতো হাহাকার করে উঠল না অহল্যা বা ইন্দ্রের মতো কাকুতি-মিনতিতেও গেল না। ঋষির সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে।

গৌতম বললেন, 'অস্থির তুমি। তুমি অভিশাপযোগ্যা। আগামী এক সহস্র বছর এই পর্ণকুটিরের সামনে পাষাণ হয়ে থাকবে তুমি। বুঝবে সবকিছু, কিন্তু বলতে পারবে না। খিদে পাবে তোমার, কিন্তু আহার করতে পারবে না।'

বলে নিজগৃহের দিক থেকে মুখ ফেরালেন গৌতম। গভীর অরণ্যের দিকে মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগলেন ঋষি গৌতম।

অহল্যা কণ্ঠকে উঁচুতে তুলে বলে উঠল, 'স্বর্গসুখের চেয়ে দেহসুখ লোভনীয়। আরেকবার অপার দেহতৃপ্তির বিনিময়ে আরও সহস্র বছর পাষাণ হয়ে থাকতে আমার আপত্তি নেই ঋষি গৌতম।'

অহল্যার এই কথাগুলো বাতাসে ভর করে গৌতমের কানে এসে বাজল।

থমকে গেলেন ঋষি গৌতম।

নিজেকে হঠাৎ দেউলিয়া বলে মনে হতে লাগল গৌতমের।

তুমি কে হে বাপু

'তুমি কে হে বাপু, সুখনিদ্রায় বিঘ্ন ঘটাতে এলে?' বেদব্যাস জিজ্ঞেস করলেন।

'অপরাধ মার্জনা করবেন। আপনার সঙ্গে দেখা করা আমার ভীষণ প্রয়োজন। আবেগ প্রবল বলে সময়জ্ঞান বর্জিত হয়েছি।'

'তা যাক, তোমার পরিচয় জানতে চেয়েছি, বলোনি।'

'আজ্ঞে, আমার নাম অদ্বৈত, অদ্বৈত মল্লবর্মণ।'

'মল্লবর্মণ! অদ্বৈত বুঝলাম, মল্লবর্মণ বুঝতে পারছি না।' বিস্মিত কণ্ঠ ব্যাসদেবের।

'আজ্ঞে, এ আমার বংশধারার পদবি। আমার বংশজ্ঞাপক নাম এটি।'

'বংশজ্ঞাপক নামাংশও আছে নাকি এখন পৃথিবীতে! কই আমার সময়ে তো এসব ছিল না!'

'আপনার সময়ে একটা যুগ গেছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—এ তিন যুগের সমাজচেহারা প্রায় একরকম ছিল।'

'আর এখন?'

'এখন কলিযুগ। মানুষের আসল নামের সঙ্গে পদবি জুড়তে হয়। ওই পদবিতেই যত মানমর্যাদা। এখন পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা তেমন নয়, যত না পদবিতে।'

'অদ্বৈত, তোমার কথা ভালো করে বুঝতে পারছি না আমি। আমার কালে কারও তো পদবি ছিল না। দ্রোণ, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর, গান্ধারী, সত্যবতী—কারও নামের শেষে কোনো বংশজ্ঞাপক পদবি তো ছিল না! আর আমিও তো ব্যবহার করিনি! শুধু আমি কেন, ত্রেতা যুগের মহান কবি বাল্মীকি, তিনিও তো রামায়ণে কারও নামের শেষে পদবির উল্লেখ করেননি! মানুষের আসল নামটাই তো তার পরিচয় বহন করত।'

এতক্ষণ কথা বলে হাঁপিয়ে উঠলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব। দম নেওয়ার জন্য থামলেন।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ব্যাসদেবের মুখের দিকে নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকলেন।

ছোট একটা শ্বাস টেনে ব্যাসদেব আবার বললেন, 'পদবি জুড়ে একজন মানুষের নামকে লম্বা করার কারণ কী?'

'ওই পদবিতেই তার জাতিত্ব, মানে তার উচ্চতা ও নীচতা প্রকাশ পায়।'

'দেখ ছোকরা, সেই প্রথম থেকেই হেঁয়ালি করে কথা বলে যাচ্ছ! বয়স হয়ে গেছে আমার। কর গুনে হিসেব রাখিনি। তবে হাজারদুয়েক বছর তো হবেই। সব হেঁয়ালির অর্থ বুঝতে পারি না এখন। একটু ঝেড়ে কাশ তো বাছা!' ধীরে ধীরে বললেন ব্যাসদেব।

'আপনার সময়েও তো সমাজে চারটা বর্ণ ছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র?'

'ছিল তো। আমিই তো গীতায় শ্রীকৃষ্ণের দোহাই দিয়ে চতুর্বর্ণের কথা লিখেছি! এটাও উল্লেখ করেছি যে, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে এই বিভাজন।'

'এখনকার পৃথিবীতে গুণ আর কর্মকে ভিত্তি করে মানুষের বিভাজন হয় না।'

'তাহলে!'

'কোথায় জন্মালাম, সেটাই মুখ্য বিষয়। বিএ, এমএ পাস দিয়ে মন্ত্রী ব্যারিস্টার হলেও পরিচয়ের সময় ব্রাহ্মণ সন্তান শূদ্র সন্তান এসব বলে পরিচয় দেওয়া হয়। জন্মস্থানটাই আসল, গুণের মূল্য শূন্য।'

'জন্মস্থান মানে! হস্তিনাপুর, পাঞ্চাল, অবন্তী, গান্ধার, কলিঙ্গ—এরকম স্থানের কথা বলছ তুমি? এসব স্থানে জন্মালে...।'

'না, না, মহামহিম! এরকম স্থানগত জন্মের কথা বলছি না আমি! আমি বলতে চাইছি বংশের কথা।' ব্যাসদেবের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন অদ্বৈত।

'বুঝিয়ে বল।'

'আপনার সময়ে তো চন্দ্রবংশ, সূর্যবংশ, যাদববংশ—এসব ছিল। চতুর্বর্ণের ব্যাপারটাও ছিল। তবে আজকের ভারতবর্ষের মতো প্রকট ছিল না। এখন মানুষের পরিচয় হয় ব্রাহ্মণ, শূদ্র—এসব দিয়ে। ব্রাহ্মণরা মাথায় তুলে রাখার আর শূদ্ররা পায়ে পিষে মারার। শূদ্রদের মধ্যে আবার অনেক শ্রেণিবিভাজন করে রেখেছে ব্রাহ্মণরা। উত্তম শূদ্র এবং অধম শূদ্র। আমি অধম শূদ্রের মানুষ।'

'মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে আমার! শূদ্রের মধ্যে আবার উত্তম অধম কী? শূদ্রতো শূদ্রই!' বিচলিত কণ্ঠে বললেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।

'শূদ্রদের মধ্যে নমঃশূদ্র নামে আরেকটা শ্রেণি করা হয়েছে। মেথর, ব্যাধ, ধোপা, নাপিত চণ্ডাল, জেলে—এরা নমঃশূদ্রের মানুষ। এদের উল্লেখের আগে নমঃ মানে মাননীয় এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সত্য, প্রকৃত পক্ষে এরা নরাধম।' ম্রিয়মাণ গলায় বলে গেলেন অদ্বৈত।

ব্যাসদেবের চোখ এবার কপালে উঠল, 'বলো কী ছোকরা! তাহলে তো আমিও নরাধম! জেলেনারীর গর্ভে যে আমার জন্ম!'

অদ্বৈত এবার মিষ্টি একটু হাসলেন। বললেন, 'নানা যুক্তি খাড়া করে আপনাকে তাবড় তাবড় পণ্ডিতরা ব্রাহ্মণ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছেন এখন পৃথিবীতে।'

'ব্রাহ্মণ! সে কী রকম?'

'মেছোনির পেটে আপনি জন্মালেও বাবা তো আপনার ব্রাহ্মণ, দোর্দণ্ডপ্রতাপী ঋষি পরাশর আপনার বাবা। মা যা-ই হোন, পিতৃকুলের বিচারে আপনি নাকি ব্রাহ্মণ!'

'তা কী করে হয়! ভারতবর্ষে পিতার চেয়ে মায়ের মর্যাদা বেশি। মাকেই স্বর্গপ্রাপ্তির আধার হিসেবে সম্বোধন করা হয়। মায়ের স্থান পিতার চেয়েও অনেক উঁচুতে।' বলতে বলতে উদাস হয়ে গেলেন ব্যাসদেব। তখন মা মৎস্যগন্ধার কথা মনে পড়ে গেল তাঁর।

উপরিচরবসু নামের এক রাজার কামের ফসল তার মা। স্ত্রীকে প্রাসাদে রেখে মৃগয়ায় গিয়েছিলেন তিনি। অরণ্যমধ্যেই কামাসক্ত হন। তিনি সংযমী পুরুষ ছিলেন না। বীর্য স্খলিত হলো তাঁর। তিনি যে বীর্যবান পুরুষ, স্ত্রীর কাছে তার তো প্রমাণ দেওয়া দরকার! অতঃপর বাজপাখির পায়ে বীর্যধারক পত্র বেঁধে রাজধানীতে পাঠালেন। আকাশপথে আরেকটি বাজ পাখির আক্রমণে সেই বীর্য পতিত হলো যমুনাজলে। ওই বীর্য ভক্ষণ করল বিশাল এক মৎস্যা। মাছের পেটেই বড় হতে থাকল শিশু। কালক্রমে জেলের জালে মাছটি ধরা পড়ল। পেট থেকে বের হলো এক কন্যা আর এক পুত্র। সংবাদ পেয়ে রাজা উপরিচর পুত্রসন্তানটিকে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। কন্যাটি থেকে গেল জেলেটির ঘরে। কন্যাটির সারা গায়ে মাছের গন্ধ, তাই তার নাম হলো মৎস্যগন্ধা। ধীবররাজের ঘরে বড় হতে লাগল কন্যাটি। কালো কিন্তু অসাধারণ সুন্দরী মৎস্যগন্ধা। বিবাহযোগ্য হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। কিন্তু এই মেয়েকে বিয়ে করবে কে? ওর শরীর থেকে যে বিদঘুটে মাছের গন্ধ বেরোয়! চিন্তিত হলেন দাশরাজা। বাড়ির পাশেই যমুনানদী, সেখানে লোকপারাপারের ঘাট। কত মুনিঋষির যাতায়াত ওই খেয়াঘাট দিয়ে! খেয়া পারাপার করানোর জন্য সেই ঘাটেই পাঠালেন তিনি মৎস্যগন্ধাকে। তৃপ্ত

হয়ে কোনো ঋষি যদি আশীর্বাদ করেন, কন্যাটির শরীর থেকে মাছের গন্ধ দূর হতেই পারে।

অনেকদিন পর সেই আশীর্বাদের বিকেলটি এলো। সন্ধ্যা হয় হয় সময়ে পরাশর মুনি এলেন খেয়া পার হতে। ওই বিকেলে তিনি একাই যাত্রী ছিলেন। কূল থেকে একটু দূরে গেলে মুনির নজর পড়ল মৎস্যগন্ধার সজীব দেহের ওপর। মৎস্যগন্ধা আপনমনে নৌকা বাইছে আর আনমনে তার দিকে তাকিয়ে আছেন পরাশর। শ্মশ্রুধারী শীর্ণদেহী মুনির মনে তীব্রভাবে রিরংসা জাগল। এবং যমুনার মধ্যিখানে অনেকটা জোর করে উপগত হলেন তিনি মৎস্যগন্ধার সঙ্গে। ওপারে উঠে যাবার সময় অবশ্য তিনি আশীর্বাদ করে গেলেন—আজ হতে তোমার শরীর থেকে মাছের গন্ধ উধাও হয়ে যাবে। পুষ্পগন্ধী হবে তুমি।

অনেকটা আপন মনে আবার বলতে শুরু করলেন ব্যাসদেব, 'ঋষি পরাশর ব্রাহ্মণ, মানি। কিন্তু মা তো আমার জেলেনি! মাছের পেটে জন্মেছেন, জেলের ঘরে লালিতপালিত হয়েছেন। সেই মায়ের গর্ভে জন্মানো আমি কী করে ব্রাহ্মণ হই? মায়ের পরিচয়েই তো আমার পরিচয়! জেলেনির সন্তান বলে পরিচয় দিতে পেরে আমার গর্বের কি শেষ আছে?'

অদ্বৈত মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'মুনিবর পরাশরের সঙ্গে আপনার আর সাক্ষাৎ হয়নি?'

'হয়েছে।' উদাস গলা ব্যাসদেবের।

'ক্ষণিক রমণেচ্ছায় উত্তেজিত হয়ে একজন পূতপবিত্র কুমারীকে যে তিনি রমণ করলেন, তার জন্য কি তাঁর মধ্যে কোনো বিবেক যন্ত্রণা জাগেনি? জিজ্ঞেস করেননি আপনি?' উত্তেজিত গলায় বললেন অদ্বৈত।

অদ্বৈতের কথা যেন শুনতে পাননি, এমনভাবে বলতে লাগলেন ব্যাসদেব, 'কী নিদারুণ লজ্জা আর কী দুঃসহ কষ্টের দিন যে গেছে মায়ের! দশ মাস পিত্রালয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে জীবনযাপন করে গেছেন মা। শুধু দাশরাজা আর তাঁর স্ত্রী জানতেন কন্যার লাঞ্ছনার কথা। শাড়ির আঁচলে উঁচু পেট ঢেকে প্রতি মুহূর্তে যন্ত্রণা পেতে পেতে সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে গেছেন আমার দুঃখিনী মা-টি। এক বিকেলে আমাকে প্রসব করলেন তিনি। পরাশর এসে যজন-যাজন-অধ্যয়নের দোহাই দিয়ে আমাকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে গেলেন একদিন। তাঁর পূর্বকৃত রিরংসাপরায়ণতার কথা কতবার জিজ্ঞেস করার জন্য মনস্থ করেছি, কিন্তু তাঁর সামনে গিয়ে কুঁকড়ে গেছি আমি। তোমার জিজ্ঞাসাগুলো আমার মনে যে জাগেনি এমন নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে জিজ্ঞেস করবার শক্তি আমার মধ্যে সঞ্চয় করতে পারিনি।

তবে তাঁকে আমি সারাজীবন ক্ষমা করতে পারিনি। আমার গোটা জীবনের আরাধ্য থেকে গেছেন আমার মা।'

'আপনার জীবনে ঋষি পরাশরের কোনোই কি প্রভাব নেই?'

'আছে। অবশ্যই আছে। এই যে, আমার বেদ-বেদান্ত পাঠ, এই যে আমার যজন-যাজন, সর্বোপরি গীতা মহাভারত থেকে শুরু করে অষ্টাদশ পুরাণাদি লেখার এই যে জ্ঞানগম্যি, তার সবটাই তো ঋষি পরাশরের কাছ থেকে পাওয়া!'

"গীতার কথা তুললেনই যখন, একটা প্রশ্ন করি। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মনে যখন মৃত্যুভয় ঢোকে, পুণ্যসঞ্চয়ের আশায় যে বইটি প্রথমেই গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন শুরু করে, তার নাম 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'। তাদের বিশ্বাস, এই গ্রন্থই তাদের স্বর্গে নিয়ে যাবে। শুধু তা-ই নয়, শ্মশানগামী মৃতদেহের বুকের ওপর এই গ্রন্থটি রাখা হয়। ভেবে দেখুন, আপনি এবং আপনার গ্রন্থ ভারতীয় সনাতনসমাজে কত গভীরভাবে মাননীয়। অথচ...।" কথা সম্পূর্ণ না করে থেমে গেলেন অদ্বৈত।

'অথচ, অথচ কী অদ্বৈত?' দ্রুত জিজ্ঞেস করলেন ব্যাসদেব।

মহাপণ্ডিত ঋষিবর ব্যাসদেবের মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে বড় ভালো লাগল অদ্বৈতের। সেই ভালোলাগা কণ্ঠেই বললেন, 'না বলছিলাম কি, সেই মাননীয় ব্যাসদেবের উত্তরাধিকারীদের প্রতি বর্তমান ভারতবর্ষে কী ভীষণরকম ঘৃণা বর্ষিত হয়, তা নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস হবে না আপনার। আমরা নিকৃষ্ট জাতি, মাছমারার জন্যই আমাদের জন্ম, অধ্যয়ন করার অধিকার আমাদের নেই। যদিও দু-চারজন শিক্ষিত জেলেকে কৃত্রিম হাসিমুখে গ্রহণ করে ওরা, কোনো কিছু লিখতে গেলেই যত ঝঞ্ঝাট! জেলে আবার কী লিখবে? ওরা লিখতে এলে, পড়তে এলে মাছ মারবে কে, এরকমই ভাবনা ওদের।'

'এসব কী বলছ তুমি!' বিব্রত কণ্ঠে শুধালেন ব্যাসদেব।

'অপরাধ নেবেন না মাননীয়। কোনোরকমে ম্যাট্রিক পাস করেছিলাম আমি। কোন ভূতে পেল আমাকে, লিখতে বসলাম একদিন!'

'কী লিখলে তুমি?'

"কী আর লিখব ঋষিবর! আমার সমাজটাকেই তো চিনি ভালো করে! ভালো করে না চিনে তো আর লিখা যায় না! তাই আমার সমাজ নিয়ে একটা উপন্যাস লিখলাম, 'তিতাস একটি নদীর নাম' নামে।"

'উপন্যাস কী?'

"আপনিও উপন্যাস লিখেছেন, কবিতায়, 'মহাভারত' নামে। আমি লিখেছি গদ্যে। সাদা কথায় কাহিনি বলা যায় উপন্যাসকে।"

'সবাই লিখে, তুমিও লিখেছ। আপত্তিটা কোথায়?' বললেন ব্যাসদেব।

"আপত্তিটা কোথায় ভালো করে জানি না। তবে আমার আগে জেলেদের নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা উপন্যাস লিখেছিলেন, 'পদ্মানদীর মাঝি' নামে।"

'জেলেদের নিয়ে তুমিও লিখলে। তুমি যেহেতু জেলেসমাজের লেখক, তোমার তো লেখার দায়িত্ব ও অধিকার দুটোই আছে।'

"লিখেই আমার কাল হলো। রে রে করে উঠল সবাই। একজন ব্রাহ্মণ লিখেছে ঠিক আছে, কোথাকার কোন অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সে লিখতে যাবে কেন? এ নিয়ে নানা কথাবার্তা? একদিন ওই উচ্চবর্ণেরই এক লিখিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' থাকতে 'তিতাস একটি নদীর নাম' লিখতে গেলে কেন? কাগজকলমের অপচয় নয় কি?"

'তো তুমি কী বললে?' বিস্মিত ব্যাসদেব।

'আমি আর কী বলব মহর্ষি! বললাম, মানিক তো বাওনের পোলা আর আমি জাউলার পোলা।'

স্মিত চোখে অদ্বৈতের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ব্যাসদেব। মনে মনে তাঁর তারিফ না করে পারলেন না। অদ্বৈত যখন আজ বিকেলে এলেন, বড়ই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তিনি। দুপুরের আহার শেষে দিবানিদ্রা যাওয়া তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যেস। ডাল, আলুভর্তা আর চচ্চড়িটাও বেশ ভালো হয়েছিল আজ। প্রয়োজনাতিরিক্ত খেয়েও ফেলেছিলেন। নিদ্রাটাও এসেছিল জম্পেশ। দৌবারিক সেই নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে জানিয়েছিল, কোন এক অদ্বৈত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। চোখেমুখে প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকেছিলেন তিনি। ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর ভেতরের বিরক্তি কখন কেটে গেছে, বুঝতে পারেননি ব্যাসদেব। এখন অদ্বৈতের সঙ্গে কথা বলতে বেশ ভালোই লাগছে তাঁর।

চিরজীবীদের একজন তিনি। হনুমানজীও চিরজীবী। ব্যাসদেবের দুটো আবাসস্থলের পরেই হনুমানজীর আবাসস্থল। আরও গোটাদশেক চিরজীবী এই এলাকায় বসবাস করেন। এটা স্বর্গের অত্যুত্তম এলাকা। স্বর্গের দক্ষিণাংশে এই এলাকাটি। উত্তরাংশে অন্যান্য পুণ্যবানদের বসবাস। তাঁদের আবার স্বর্গবাসের সময় নির্ধারণ করা আছে। চিত্রগুপ্তের পরামর্শক্রমে যমরাজাই নির্ধারণ করেন সময়। পৃথিবীতে পুণ্যার্জনের মাত্রার ওপর সময়

নিরূপণ করা হয়। পুণ্য বেশি হলে বেশিদিন স্বর্গবাসের অনুমতি মেলে, পুণ্য কম হলে কম সময়ের জন্য। কারও জন্য সহস্র বছর, কারও জন্য সহস্র সহস্র বছর। আবার কারও জন্য দু'চার পঞ্চাশ একশ বছর। যুধিষ্ঠিরাদি অন্যান্য পুণ্যবানরা সহস্র সহস্র বছরের স্বর্গবাসের অধিকার পেয়েছেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ পেয়েছেন দুইশ বছরের স্বর্গবাসের অধিকার। সাধারণ স্বর্গবাসীরা চিরজীবীদের এলাকায় অনুমতি ছাড়া আসতে পারেন না। চিত্রগুপ্তের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। এই অনুমতি নিয়ে গান্ধারী, সত্যবতী, দ্রৌপদী, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, যুধিষ্ঠির—এঁরা মাঝেমধ্যে ব্যাসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। যেমন আজকে এসেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বললেন, 'যাক ওসব কথা। পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ সে-যুগেও ছিল, তোমাদের যুগেও তেমনি আছে, অন্যের উন্নতি সহ্য করতে পারে না তারা। যেমন অর্জুন সহ্য করতে পারেনি একলব্যের সমরকুশলতার উন্নয়ন। তোমার ক্ষেত্রেও হয়তো সেরকম কিছু একটা হয়েছে! এই ধরনের ক্ষুদ্র লোক না থাকলে মহতকে চেনা দায়। আচ্ছা, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি—কোন পুণ্যবলে তুমি স্বর্গে আসতে পারলে?'

'আমার যে কী পুণ্য, আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বেঁচেছিলাম আমি। আপনার যেমন যমুনানদীর দ্বীপে জন্ম, তেমনি তিতাসনদীর পারে আমার জন্ম। আমার চেয়ে ভাগ্যবান আপনি। জীবনের প্রথমে মায়ের স্নেহ এবং শেষে পিতার আশ্রয় পেয়েছিলেন। খুব কম বয়সেই মা-বাবা দুজনেই আমাকে ছেড়ে পরলোকে চলে আসেন। তারপর না ঘরকা না ঘাটকার জীবন আমার! বোন ছিল একজন। বিয়ের পর সেও মারা গেল। গোকর্ণঘাটের এক স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করলাম আমি। কুমিল্লায় এসে কলেজে পড়তে চাইলাম। পারলাম না। টাকাপয়সা ছিল না তো আমার কাছে! তার পর কলকাতা। পত্রিকা অফিসে চাকরি করতাম, থাকতাম মেসে! বেতন যা পেতাম, সামান্য আমার জন্য রেখে বাকিগুলো গাঁয়ের আত্মীয়স্বজনের সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দিতাম। তারপর একদিন যক্ষ্মা হলো, মারা গেলাম। যম রাজার সামনে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে। পাশে বসা চিত্রগুপ্ত যমরাজের কানে কানে কীসব বললেন! গুরুগম্ভীর কণ্ঠে যমরাজ বললেন—বালক, পৃথিবীতে বেশকিছু ভালো কাজ করেছ তুমি। নিজের সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখ, বেদনাপ্রাপ্তির বিবরণ দিয়ে কী যেন একটা লিখেছ। তোমার দেশবাসীরা এজন্য ধন্যধন্য করছে তোমার নামে। আর তুমি নাকি পরোপকারী। যাও, তোমাকে দুই শতাব্দী স্বর্গবাসের অনুমতি দিলাম। সুখে স্বর্গবাস করতে থাকো তুমি। এই আমার ইতিহাস মহর্ষি।'

ব্যাসদেব ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমার কথায় আমি খুব তৃপ্ত হয়েছি। আমার পরে আমার বংশধারাকে বহমান রেখেছ তুমি। লেখার ব্যাপারটিও তুমি চর্চা করেছ। নিশ্চয়ই ভালো কিছু লিখেছ, না হলে গোমড়ামুখো যমরাজ তোমার প্রশংসা করবেন কেন?'

'আপনার বংশধারা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হতে বসেছে মহর্ষি।'

'কেন কে! ওদের প্রজননক্ষমতা কি ফুরিয়ে গেছে?'

'না, তা নয়। এই সমাজে ব্যাপকভাবে প্রজননক্রিয়া চলমান। সন্তানাধিক্য প্রতি ঘরে। সমস্যা অন্যখানে।'

'অন্যখানে! সে কেমন!'

'পদবি দিয়েই তো এখন মানুষের বংশমর্যাদা, তাই জেলেরা তাদের মূল পদবি নামের শেষে আর লিখছে না। লিখছে উঁচু জাতের পদবি, এই যেমন সেনগুপ্ত, চৌধুরী, রায়, চক্রবর্তী এসব। এতে জেলেদের আসল পরিচয় উঁচু পদবিতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তাই বলছিলাম, আগামী দশ বিশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে কোনো জেলে থাকবে না। আপনার অথবা আমার অহংকার করবার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না ভূ-ভারতে।' বলে হা হা করে হেসে উঠলেন অদ্বৈত। পরক্ষণেই নিজের অশোভন আচরণ টের পেলেন।

ত্বরিত বললেন, 'ক্ষমা করবেন মহর্ষি। অশোভনভাবে হেসে উঠলাম।'

'বালক, তোমার এ হাসির মর্মার্থ আমি বুঝি। এ হাসিতে তোমার হৃদয়ের রক্তক্ষরণের ব্যাপারটি মিশে আছে, অনুধাবন করতে পারছি আমি। তুমি ভয় পেয়ো না।'

'যদি নির্ভয় করেন, আরেকটি প্রশ্ন করি আপনাকে।'

অদ্বৈতের দিকে প্রীতির চোখে তাকালেন ব্যাসদেব। শ্মশ্রুমণ্ডিত বিশাল আকৃতির এই কৃষ্ণকালো মানুষটির ভেতর বিরাট একটা দরদি মন আছে। ওই হৃদয় দিয়েই মানুষকে বিচার করেন তিনি। অদ্বৈতকেও হৃদয় দিয়ে বুঝবার চাইলেন। অদ্বৈতের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'বলো, কী জানতে চাইছ তুমি?'

"মহাভারত' জুড়ে আপনি জড়িয়ে-ছড়িয়ে আছেন। এই মহাকাব্যের পরতে পরতে আপনার আদর্শ, আপনার ভাবনা, জীবন সম্পর্কে আপনার নিজস্ব বিচার বিশ্লেষণ দৃশ্যমান। সত্য ও সততার জয়গান করেছেন আপনি। দুষ্টের বিনাশের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন মহাকাব্যটি জুড়ে। ধর্মের জয় অনিবার্য—এই কথাই বলেছেন বারবার 'মহাভারতে'। শুধু 'মহাভারত' কেন 'গীতা'তেও আপনি ন্যায় ও সত্যের জয়গান করে এসেছেন। নিজে

ন্যায়বান না হলে কখনো ন্যায়ের পক্ষে কথা বলতে পারে না কেউ। কিন্তু ভাসুর হয়ে অনুজের বউদের সঙ্গম করেছেন আপনি! একজন ন্যায়ের ধ্বজাধারী হয়ে একাজ করতে গেলেন কেন?"

অদ্বৈতের প্রশ্ন শুনে দ্রুত মাথা নোয়ালেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে অধোবদনে বসে থাকলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুললেন। বললেন, 'দেখ অদ্বৈত, আজ পর্যন্ত কেউ সাহস করেনি আমাকে এই প্রশ্নটি করার। তুমি দুঃসাহসী। আর দুঃসাহসী হবেই না কেন? তোমার তো একটা আদি-ঐতিহ্য আছে। সনাতনীদের ধর্মে দশ অবতারের কথা আছে না?'

প্রশ্ন করে অদ্বৈতের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলেন না তিনি। বললেন, দশ অবতারের প্রথম অবতারের নাম মৎস্য অবতার। সেই মৎস্যের সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক। আমাদের বংশধারার সঙ্গে প্রথমাবতারের অবিচ্ছিন্ন নৈকট্য। তো সেই ঐতিহ্যবাহী হয়ে এরকম প্রশ্ন করার সাহস তো তোমারই হবে! তুমি বড় কঠিন প্রশ্ন করেছ আমাকে। আমার একদিকে নৈতিকতা, অন্যদিকে মাতৃ-আদেশ। মা সত্যবতী বললেন, অনুজ-বধূদের সঙ্গে রমণে রত হও, নীতিবোধ বলল—খবরদার ব্যাস, এত বড় অন্যায় করো না। আচ্ছা অদ্বৈত, এই রকম পরিস্থিতিতে পড়লে তুমি কী করতে?'

প্রশ্নটা বুমেরাং হয়ে তাঁর দিকে ফিরে আসবে, ভাবেননি অদ্বৈত। ব্যাসদেবের প্রশ্ন শুনে অদ্বৈত ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন, 'আমি! আমি কী করতাম ঠিক করতে পারছি না!'

ব্যাসের গম্ভীর কণ্ঠ এই সময় অদ্বৈতের কানে ভেসে এলো, 'আমি ঠিক করতে পেরেছিলাম। মা মৎস্যগন্ধা, যিনি পরে রাজা শান্তনুর মহিষী হয়ে সত্যবতী হয়েছিলেন, আমার পৃথিবী ছিলেন। এই মায়ের সন্তুষ্টির জন্য লক্ষ বছরের নরকবাস আমার কাছে ঈপ্সিত ছিল। যতই অন্যায় হোক, মায়ের আদেশ ফেলি কী করে? মা-ও নিরুপায় ছিলেন, বংশধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে যে! যাকে তাকে দিয়ে তো আর পুত্রবধূদের প্রজনন করানো যায় না। তাঁর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলাম আমি। তাই প্রজনন নিষ্পন্ন করার জন্য আমাকেই নির্বাচন করলেন মা। বিবেককে গলা টিপে হত্যা করে তিন তিনবার অন্যায় কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলাম আমি।' ব্যাসদেবের কণ্ঠ দিয়ে মর্মযাতনা ঝরে ঝরে পড়তে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে অদ্বৈত প্রশ্ন করলেন, 'ফল কি শুভ হয়েছিল?'

'নিশ্চয়ই না। এই অন্যায় কার্যের ফল শুভ হয়নি। অম্বিকা, অম্বালিকা আর দাসীটির গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু আর বিদুর জন্মাল। দাসীপুত্র বলে

রাজপ্রাসাদে বিদুর অবহেলিত হলো, মুনির অভিশাপে পাণ্ডু প্রজনন ক্ষমতা হারাল। ধৃতরাষ্ট্রের একশটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মাল। ধৃতরাষ্ট্র তো অন্যায়ের ফসল! তার সন্তানরা আর কতটুকু ভালো হবে? দুঃশাসন, দুর্যোধনরা হস্তিনাজুড়ে যুদ্ধের দামামা বাজাল। কুরুক্ষেত্রের আঠারো দিনের যুদ্ধে আঠারো অক্ষৌহিণী সৈন্য প্রাণ হারাল। ধৃতরাষ্ট্রের বংশে বাতি দেওয়ার কেউ থাকল না। একটা সময়ে যুদ্ধ শেষ হলো বটে, গোটা হস্তিনায় পোড়া-রক্তভেজা মাটি আর লক্ষ নারীর হাহাকার ছাড়া আর কিছুই থাকল না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ব্যাসদেবের বুক চিরে বেরিয়ে এলো।

তারপর বললেন, 'আমার দ্বারা যে পাপটা করিয়েছিলেন মা, রক্তসমুদ্রের প্লাবনে সেই পাপ ধুয়ে-মুছে গিয়েছিল পৃথিবী থেকে।'

কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের বেদনাবিলীন চেহারা দেখে আর কিছু বলতে সাহস করলেন না অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

বাইরে তাকিয়ে দেখলেন—চারদিকে আঁধার ঘনীভূত হয়ে গেছে। মাটিতে মাথা নুইয়ে প্রণিপাত করলেন ব্যাসদেবকে। করজোড়ে বললেন, 'যাবার অনুমতি দিন মহর্ষি।'

আজকের দ্রৌপদী

এক.

দুটো বাড়ি, পাশাপাশি।

সেনবাড়ি আর ধরবাড়ি। মাঝখানে পাঁচিল, মাথা সমান। বাড়ি দুটোর মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল, আগে। ভালো রান্না হলে এবাড়ির তরকারি ওবাড়িতে যেত, শীতে ওবাড়ির পিঠে এবাড়িতে আসত, আগে। এখন আসে না। আগে সেনবাড়ির ছেলেপুলেরা ধরবাড়ির উঠানে খেলতে যেত, এখন যায় না। ধরবাড়ির ছোটরা সেনবাড়িতে খেলতে খেলতে খাটে ঘুমিয়ে পড়ত, সেনগিন্নি কোলে করে ঘুমন্ত বাচ্চাকে ধরবাড়িতে পৌছে দিতেন, এখন দেন না। দুই বাড়ির মাঝখানে এখন কন্‌ক্রিটের দেয়াল।

সেনবাড়ির কর্তা প্রতুল সেন, চন্দ্রবিকাশ ধর ওবাড়ির গার্জেন। প্রতুলবাবু টিঅ্যান্ডটির কর্মকর্তা আর ধরবাবু অ্যাডভোকেট। একজন নন্দনকাননে অফিস করেন, অন্যজন চট্টগ্রাম কোর্টবিল্ডিং-এ প্র্যাকটিস করেন। দুজনের মধ্যে গলায় গলায় ভাব। ছুটিছাঁটার দিনে একসঙ্গে বসে ধরে আর সেনে গল্প হয়, সুখদুঃখের কথা বিনিময় হয়।

সেনবাবুর ফলদ গাছের প্রতি বড় টান, বাড়ির চারপাশে গাছ লাগান। ধরবাবুর গাছের প্রতি তেমন টান নেই। বলেন, 'গাছটাছ লাগিয়ে কী হবে, শুধু পাতাপুতার আবর্জনা! তার চেয়ে খোলা জায়গা ভালো। আলো-বাতাসের অবাধ খেলা।'

সেনবাবু নাছোড়। ধরবাবুকে গাছ লাগাতেই হবে। ডবল ডবল গাছ কেনেন। একটা এবাড়িতে লাগালে আরেকটা ধরবাড়িতে লাগান। গাছ বড় হয়। এবাড়ির গাছের ডাল ওবাড়ির সীমানায় যায়। ধরবাড়ির নারকেল গাছের কাঠবিড়ালি-খাওয়া কচি ডাব সেনবাড়ির টিনের চালে পড়ে। সেনবাড়ির গিন্নি উঠানে দাঁড়িয়ে কাঠবিড়ালি তাড়ান, 'শ, শ! হুশ! যা যা মরার কাঠবিড়ালি!'

তারপর গলা উঁচিয়ে বলেন, 'ও শ্যামাদি, কাঠবিড়ালি তো সব নারকেল খেয়ে শেষ করল!'

কালক্রমে উভয় বাড়ির ছেলেপুলেরা বড় হতে লাগল। প্রাইমারি স্কুল পেরিয়ে হাই স্কুল। তারপর কলেজ। উভয় বাড়ির জৌলুস বাড়তে থাকল। বেড়ার ঘরের জায়গায় একতলা বাড়ি তুললেন ধরবাবু। আর প্রতুল সেনের ভিটেয় উঠল দোতলা বাড়ি। তাঁর ইনকাম বেশি। টিঅ্যান্ডটি'র চাকরিতে ঘুষঘাষের সুযোগসুবিধেও বেশি। উভয় পরিবারে ধনের বৈষম্য যা-ই হোক, মনের মালিন্য হয় না কখনো। পারিবারিক সম্পর্ক আগের মতোই অটুট থাকে।

সেনবাবুর তিন ছেলে, এক মেয়ে। ধরবাবুর একটাই সন্তান, ওই প্রভাসচন্দ্র ধর। কল্যাণ সেন ছাড়া প্রতুলবাবুর অন্য দুটো ছেলেই অকাজের। কল্যাণ বড়, মেজটা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে আর পড়ল না। ছোটটা হাবাগোবা। ঠেলেঠুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত এগিয়েছিল। মেয়ে শাশ্বতী ভীষণ সুন্দরী। এক কানাডানিবাসী বর শাশ্বতীর প্রতি বড় আগ্রহী হয়ে উঠল। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ওই প্রবাসীকেই মাধ্যমিক পাস শাশ্বতীকে বিয়ে দিলেন সেনবাবু। কল্যাণ সেন ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করল, চুয়েট থেকে। নামকরা একটা প্রাইভেট ফার্মে উঁচু বেতনে চাকরি পেল কল্যাণ।

প্রভাস আর্টস নিয়ে লেখাপড়া করল। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর অনার্সে ভর্তি হলো, বাংলায়। ক্রমে অনার্স, এমএ পাস করল প্রভাস। বিসিএস দিয়ে সরকারি কলেজে অধ্যাপনার চাকরিও পেল।

কল্যাণের মাঝারি হাইট, সুঠাম দেহ। উজ্জ্বল রং। চেহারায় একটু কঠোর কঠোর ভাব। সেটা জন্মগত। রাগী নয় সে, তবে চেহারা রাগী রাগী।

প্রভাস দীর্ঘদেহী। স্বাস্থ্য ভালো। কল্যাণের মতো বনেদি চেহারা নয় তার, তবে একধরনের স্নিগ্ধ কোমলতা তাকে সর্বদা ঘিরে রাখে। তার উন্নত নাসা। নাকের দু'পাশে উজ্জ্বল দুটো চোখ। চোখের সৌন্দর্যের জন্যই শুধু প্রভাসকে ভালোবাসা যায়। কম কথা বলা, সৌম্য আচরণ প্রভাসের বাড়তি গুণ।

কল্যাণ আর প্রভাসের মধ্যে রেষারেষি, ছোটবেলা থেকে। স্কুলের পড়ালেখায় কল্যাণ কিছুতেই প্রভাসকে পেছনে ফেলতে পারত না। অন্যান্য সাবজেক্টে মাঝেমধ্যে এগিয়ে থাকলেও ইংরেজি আর গণিতে প্রভাসকে অতিক্রম করতে পারত না কল্যাণ। এজন্য তার মনে চাপা ক্রোধ। সেই ক্রোধ এক বিকেলে বেরিয়ে এলো।

সবে নাইনে উঠেছে তারা। একই স্কুলে, একজন সায়েন্সে আরেকজন আর্টসে। শীতবিকেলে স্কুলমাঠে ব্যাডমিন্টনের আসর বসেছে। সিনিয়াররা খেলা ছেড়ে দিলে কল্যাণ আর প্রভাস ব্যাট হাতে নিল। দুজনে দুদিকে দাঁড়াল। অল্পক্ষণের মধ্যে খেলা জমে উঠল। দুজনেই চৌকস। তবে প্রভাসের খেলায় কারুকার্য বেশি। দর্শকও জুটে গেল অনেক। উভয়েই এক এক সেটে জয় পেল। তৃতীয় সেট চলছে। দর্শকরা উত্তেজিত। ঘন ঘন হাততালি দিচ্ছে। কেউ এদিকে, কেউ ওদিকে। প্রভাসের জন্য যেন হাততালি বেশি। দর্শকের উত্তেজনা প্রভাস-কল্যাণের মধ্যে সংক্রমিত হলো। মরণপণ লড়াইয়ে মগ্ন হলো উভয়ে। এ চাপ দিলে ও ফিরিয়ে দিচ্ছে। ও নেট ঘেঁষে কর্ক ফেলতে চাইলে এ ত্বরিতে এসে তা ওপারে পাঠিয়ে দিচ্ছে। একটা সময়ে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, কেহ নাহি হারে জিতে সমানে সমান। তৃতীয় সেটে জয় পেল প্রভাস। কল্যাণ মুখ গোমড়া করে মাঠ ছাড়ল। সেই থেকে উভয়ের মধ্যে রেষারেষি আরও বেড়ে গেল।

একদিন ধর-দম্পতি সিদ্ধান্ত নিলেন—ছেলেকে বিয়ে করাবেন। ছেলে তো এখন সরকারি মহিলা কলেজে পড়ায়! বেতনও কম পায় না। প্রভাসের বয়সও ঊনত্রিশ পেরিয়ে গেছে। ধরগিন্নি প্রভাসের মনোভাব জেনে নিলেন। বিয়েতে প্রভাসের আপত্তি নেই। ভেতরে ভেতরে মেয়েরও খোঁজখবর নেওয়া শুরু করলেন চন্দ্রবিকাশ ধর। মেয়ে পাওয়া গেল। নন্দনকাননের চৌধুরীবাড়ির মেয়ে। জীবন চৌধুরীর মানি-এক্সচেঞ্জের কাজকারবার। হাজারিগলিতে অফিস। জীবন চৌধুরীর একমাত্র কন্যা অহনা চৌধুরী। চট্টগ্রাম কলেজে দর্শনে এমএ পড়ছে। সুশ্রী, লাবণ্যময়ী, মিতভাষী। অহনার বড় গুণ—তার মধ্যে সুন্দর একটা মন আছে।

বন্ধু দিলীপকে দিয়ে প্রাইমারি কথাবার্তাও সেরে নিয়েছেন ধরবাবু। কনে দেখাতে রাজি হয়েছেন জীবন চৌধুরী। তারিখও নির্ধারিত হয়ে গেছে। সেনবাবুর সঙ্গে আলাপ না করে কনে দেখতে যান কী করে ধরবাবু! এক বিকেলে সেনবাড়িতে উপস্থিত হলেন চন্দ্রবিকাশবাবু।

ভূমিকা ছাড়া বললেন, 'বুঝলে প্রতুল, ছেলের বিয়ে দেব ঠিক করেছি। তোমার মতামত দরকার। তাই এলাম।'

'প্রভাসের বিয়ে দেবে! এত তাড়াতাড়ি!' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন প্রতুল সেন।

চন্দ্রবিকাশবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'তাড়াতাড়ি দেখলে কোথায় তুমি? প্রভাসের বয়স তো কম হলো না! উনত্রিশ পার হচ্ছে।'

একটু থেমে গলা বাড়িয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ধরবাবু আবার বললেন, 'তা তোমার সংবাদ কী? একই বছরে তো জন্ম কল্যাণের! ছেলের বিয়ের কথা ভাবছ না?'

'এতদিন তো ভাবিনি! তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে কল্যাণকে বিয়ে করিয়ে দেওয়া উচিত। দেখি, ওর মায়ের সঙ্গে আলাপ করে। ছেলের মতামতও তো নেওয়া দরকার!' বললেন সেনবাবু।

'যা করবে তাড়াতাড়ি করো। শুভস্য শীঘ্রম।'

সেনবাবু বললেন, 'তা প্রভাসের বিয়ে সম্পর্কে কী যেন বলতে এসেছিলে?'

'বলছিলাম কী, প্রভাস আমার একমাত্র ছেলে। তার মায়েরও বয়স হয়েছে। মায়ের বড় সাধ পুত্রবধূ ঘরে আনবে।' বললেন ধরবাবু। একটু ভূমিকা করেই বললেন।

এরপর কন্যা ঠিক করার কথা, চৌধুরীবাড়ির প্রসঙ্গ, জীবন চৌধুরীর ঐশ্বর্যের প্রসঙ্গ, কনে অহনা চৌধুরীর কথা বিস্তারিত বললেন। অহনা যে অসাধারণ রূপবতী, মিষ্টভাষী—এসব কথাও বলতে ভুললেন না ধরবাবু। সর্বশেষে বললেন, 'আগামী পরশু কনে দেখার তারিখ। তুমি আর বউদি না গেলে কনে দেখা অসম্পূর্ণ থাকবে।'

'তোমার ছেলে আর আমার ছেলের মধ্যে পার্থক্য কী? যাব, অবশ্য যাব।' সেনবাবু ধরবাবুকে আশ্বস্ত করলেন।

দুই

চৌধুরীবাড়ি। বিশাল ড্রইংরুম।

একদিকের সোফায় ধরগিন্নি আর সেনগিন্নি, পাশের সোফায় প্রতুলবাবু আর চন্দ্রবিকাশবাবু। তাঁদের পাশে চন্দ্রবিকাশবাবুর বন্ধু দিলীপবাবু। মুখোমুখি সোফায় চৌধুরীবাবু মানে জীবন চৌধুরী, তাঁর পাশে সহোদর সুকুমার চৌধুরী। ও পাশের সোফায় চৌধুরীগিন্নি এবং অহনা চৌধুরী। একটু দূরে ছোট একটা কাঠের সোফায় বসেছে প্রভাস।

অহনার ঘরে ঢোকা, বসার ভঙ্গি, প্রণাম করার রীতি দেখে সবাই মুগ্ধ। চন্দ্রবিকাশবাবু বলেই ফেললেন, 'অহনা মাকে আমাদের খুব পছন্দ। বেয়াই মশায়ের ইচ্ছে জানলে সামনে আগাতে আপত্তি নেই আমাদের।'

জীবন চৌধুরী সম্মতির হাসি হাসলেন।

সেনগিন্নি বললেন, 'তাহলে ছেলেতে-মেয়েতে একটু কথা বলুক।'

চৌধুরীগিন্নি বললেন, 'তাতে আমাদের আপত্তি নেই। আধুনিক যুগ। ওরা পরস্পরকে জেনে নিক।'

তারপর স্বামীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে চৌধুরীগিন্নি আবার বললেন, 'তুমি ওঁদের চা-নাস্তার তদারক করো। আমি একটু ভেতরবাড়িতে যাচ্ছি।'

অহনাকে সোফা থেকে তুললেন তিনি, তারপর প্রভাসকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এসো বাবা।'

খাবারপর্ব চুকে গেল। সবাই নানা খোশগল্পে মাতলেন। বিয়ের দিনতারিখও ধার্য হয়ে গেল। পৌষের ১৪ তারিখে বিয়ে।

প্রতুল সেনের কী হলো কে জানে, হঠাৎ বলে বসলেন, 'ছেলের বিয়েতে কিন্তু সত্তর ইঞ্চির একটা ফ্ল্যাট টিভি দিতে হবে বেয়াই মশাই।'

জীবনবাবু শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমরা সবাই শিক্ষিত মানুষ। মেয়ের বিয়েতে কী কী দিতে হবে জানি।'

'না, বললাম এজন্য যে, অনেক কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে ঠকায়। প্রথমে বলে, হেন দেব তেন দেব। দেওয়ার বেলা অষ্টরম্ভা।' প্রতুলবাবু গলায় একটু উষ্ণতা মিশিয়ে বললেন।

'আমরা সে দলের নই।'

'তার পরও কথাটা হয়ে থাকলে ভালো।'

এসময় ধরবাবু বলে উঠলেন, 'আহ প্রতুল! আমাদের তো কোনো দাবি নেই!'

'আমার আছে।' প্রতুলবাবু বললেন।

এ নিয়ে বড় একটা ফ্যাসাদ হয়ে গেল। এক কথা থেকে অন্য কথা। একটা সময়ে জীবনবাবু বললেন, 'ওঘরে মেয়ে বিয়ে দেব না আমি। আপনারা আসুন।'

জীবনবাবুর ভাই সুকুমার চৌধুরী হই হই করে উঠলেন, 'আরে দাদা, রাগ করছ কেন? বসো বসো।'

জীবনবাবু ঠান্ডা গলায় বললেন, 'প্রতুলবাবু ধরবাবুর আকাঙ্ক্ষার কথাই বলেছেন। ওঁর কথাগুলো নিশ্চয়ই ধরবাবুর কথা। প্রতুলবাবুর তো কোনো স্বার্থ নেই এখানে, ধরবাবু যা বলতে বলেছেন, প্রতুলবাবু তা-ই বলেছেন। ওরকম লোভী পরিবারে আমি মেয়ে বিয়ে দেব না।'

জীবনবাবুর কথা শুনে প্রতুল সেন মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। ধরবাবু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে জীবনবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

বড় একটা বেদনা নিয়ে সবাই বাড়ি ফিরে এলেন।

আলাপের মাঝখানে প্রতুলবাবু হঠাৎ সত্তর ইঞ্চি টিভি দাবি করে বসলেন! টিভির ব্যাপারে ধরপরিবারের কোনো দাবি ছিল না। তার পরও সেনবাবুর টিভির দাবিতে ভীষণ একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল। ধরবাবু বোকা বনে গেলেন। ধরগিন্নিও অবাক হয়ে গেছেন। প্রভাসও এরকম দাবির কূলকিনারা খুঁজে পেল না। গোটা পরিবার হতভম্ব। সেনবাবুকে এর কারণ জিজ্ঞেস করার রুচি হলো না ধরবাবুর। যে-লোক এই পরিবারের এত নিকটবন্ধু, সে কিনা প্যাঁচ মেরে বিয়েটা ভেঙে দিল!

একদিন, সে মাসতিনেক পরে, প্রতুলবাবুর মারপ্যাঁচের অর্থ খোলসা হয়ে গেল ধরপরিবারের কাছে।

তিনমাস পরে কল্যাণের বিয়ে হলো। প্রতুলবাবু ওই অহনা চৌধুরীকেই পুত্রবধূ করে ঘরে আনলেন।

প্রভাসের কনে-দেখার আসরেই অহনাকে নিজের পুত্রবধূ হিসেবে পছন্দ হয়ে গিয়েছিল প্রতুল সেনের। টিভির প্যাঁচটা দিয়ে বিয়ে ভাঙানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সফলও হয়েছিলেন।

ধরপরিবার স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এতবড় চালাকি! এতবড় বেইমানি! এতদিনের ঘনিষ্ঠ প্রতুল সেন এত বড় মীরজাফর!

দুই বাড়ির সীমানায় দেয়াল উঠল। মুখ দেখাদেখি বন্ধ হলো। পাড়ার মানুষের মুখে মুখে এই ঘটনা কিস্‌সার রূপ নিল।

অহনা সংসার করে, সুখের সংসার। কল্যাণ তাকে আদরে-সোহাগে ভরিয়ে রেখেছে। শাশুড়ি বউমা ছাড়া কথা বলে না। প্রতুলবাবু বলেন, আমার এক মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে গেছে, বদলে আরেক মেয়ে ঘরে এসেছে। অহনা আমার পুত্রবধূ নয়, মেয়ে।

তার পরও অহনার ভেতরটা কেন জানি জ্বলে, এক অজানা বেদনা তাকে কুরে কুরে খায়।

দোতলা থেকে ধরবাড়ির সবকিছু দেখা যায়—উঠান, কলতলা, তুলসীর মঞ্চ। অহনা চন্দ্রবিকাশবাবুকে দেখে, ধরগিন্নিকে দেখে আর দেখে

প্রভাসকে। প্রভাস মাথা নিচু করে ঘরে ঢোকে, মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরোয়। কখনো ওপরদিকে মাথা তোলে না! তুললে দেখত—অহনা নামের এক নারী কী অপরিসীম তৃষ্ণা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে!

তিন

স্বয়ংবর সভা। দ্রৌপদী আজ এই সভা থেকে তার স্বামী নির্বাচন করবে। পাঞ্চালরাজের কন্যা দ্রৌপদী। কন্যা বিবাহযোগ্যা হলে স্বয়ংবর সভার আয়োজন করেন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ। দ্রৌপদী শ্যামবর্ণা, পদ্মপলাশলোচনা। কুঞ্চিত কেশকলাপ। নিত্যযৌবনা।

রাজা পাঞ্চাল একটি আকাশযন্ত্র এবং একটি প্রায়-দুর্জয় ধনু নির্মাণ করালেন। ঘোষণা দিলেন, যে এই ধনুতে জ্যা যোজনা করে আকাশযন্ত্রের মধ্যদিয়ে লক্ষ্যবস্তু বিদ্ধ করতে পারবে, তাকেই স্বামী হিসেবে বরণ করবে দ্রৌপদী।

স্বয়ংবর সভায় নানা দেশের রাজপুত্ররা উপস্থিত হয়েছে। উপস্থিত হয়েছে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের সঙ্গে কর্ণ। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে উপস্থিত আছে পঞ্চপাণ্ডব।

রাজঘোষণার শেষে কর্ণ এগিয়ে এলো। কারণ সে বীর, অসাধারণ ধনুর্ধর। দীপ্তিময় দেহ তার। দীর্ঘদেহী। উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল নেত্র। মহাবীর কর্ণ অগ্রসর হয়ে ধনুতে তীর যোজনা করে।

কর্ণ সূতপুত্র। একথা কারও অজানা নয়। যতই উপযুক্ত হোক, হীনজাতীয় সূতপুত্রকে তো আর বিয়ে করা যায় না!

দ্রৌপদী বলল, 'কর্ণ যতবড় বলবীর্যশালী পুরুষই হোক না কেন, উচ্চবংশে জন্ম নয় তার। সুতরাং কর্ণ ক্ষত্রিয়কন্যার বিবাহযোগ্য পাত্র নয়। কর্ণ লক্ষ্যবস্তু ভেদ করতে সক্ষম হলেও আমি তাকে বিয়ে করব না।'

দ্রৌপদীর কথা শুনে সভার মধ্য হতে উপহাসধ্বনি উঠল। অপমানিত কর্ণ ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল। ভূমিতে সজোরে ধনুটি নিক্ষেপ করে সভাস্থল ত্যাগ করল সে। তার পর সমস্ত ক্ষত্রিয় একের পর এক অকৃতকার্য হলো।

ফাঁপরে পড়ে গেলেন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ। কন্যার স্বয়ংবর সভা বুঝি ভণ্ডুল হতে চলল!

নিরুপায় দ্রুপদ ঘোষণা করলেন, 'সভায় উপস্থিত যে-কোনোজন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।'

কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে ছদ্মবেশী অর্জুন লক্ষ্যভেদ করল। দ্রৌপদী তাকে বরমাল্য দিয়ে বরণ করল। কিন্তু সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান সেখানে হলো না। দ্রৌপদীকে নিয়ে পঞ্চভ্রাতা মা-কুন্তীর নিকটে উপস্থিত হলো। মা তখন গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করছিলেন।

গৃহের বাহির থেকে পুত্ররা বলল, 'মা, এক অসাধারণ সামগ্রী আমরা ভিক্ষে করে এনেছি। ওটা নিয়ে কী করব এখন?'

ঘরের ভেতর থেকে কুন্তী বললেন, 'তোমরা পাঁচজন মিলে সে জিনিস ভোগ করো।'

এরপর পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে হলো। ভ্রাতৃগণের মধ্যে স্থির হলো—দ্রৌপদী এক একজন পাণ্ডবের সঙ্গে এক বছর করে বাস করবে, তখন অন্য ভাইয়েরা দ্রৌপদীর সঙ্গে ভাসুরের মতো আচরণ করবে।

তারপর তো দ্রৌপদী আর পঞ্চপাণ্ডবের জীবনে কত উথালপাতাল! কত নিগ্রহ, কত নির্যাতন, কত কপটতা, কত দুরভিসন্ধি! এবং সবশেষে যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

কুরুক্ষেত্রের বিপরীত প্রান্তে কৌরব আর পাণ্ডবদের তাঁবু পড়েছে। এক প্রান্তে কুরুসৈন্য, দুর্যোধন-দুঃশাসন। অন্য দিকে পাণ্ডব-তাঁবু। সৈন্যসামন্ত, কৃষ্ণ, দ্রৌপদী, পঞ্চপাণ্ডব এবং স্বপক্ষের সসৈন্য রাজন্যবর্গ।

সমস্ত দিন রণদামামা। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। হাজার সৈন্যের প্রাণপাত। কৌরবদের প্রথম সেনাপতি ভীষ্ম। দশ দিন যুদ্ধ করে শরশয্যা গ্রহণ করলেন তিনি। এর পরের সেনাপতি দ্রোণ। দ্রোণের মৃত্যুর পর যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব পড়ল কর্ণের ওপর। যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণ অপ্রতিরোধ্য। দোর্দণ্ডপ্রতাপে সে গোটা যুদ্ধক্ষেত্র দাপিয়ে বেড়ায়। রথী, মহারথীরা তার সামনে দাঁড়াতে পারে না। অর্জুন ছাড়া অন্যান্য পাণ্ডব কর্ণের হাতে পরাস্ত হচ্ছে বারবার। নিত্যদিনের যুদ্ধকথা পাণ্ডবশিবির পর্যন্ত পৌছে যায়। দিনান্তে পাণ্ডরশিবিরে পরামর্শসভা বসে। সেখানে কর্ণের শৌর্যবীর্যের কথা আলোচিত হয়। শুনে দ্রৌপদীর ভেতরে আলোড়ন ওঠে। কীসের যেন ঝড় বইতে থাকে দ্রৌপদীর হৃদয়ে! এ কীসের মন্থন অনুভব করছে দ্রৌপদী? ভেবে কূল পায় না। কর্ণের বীরত্বগাথা শুনে দ্রৌপদীর খুশি হবার কথা নয়। কিন্তু কেন জানি, কর্ণকথা শুনে দ্রৌপদীর উল্লাস বোধ হয়। কেন? কেন?

দ্রৌপদী একা বসে ভাবে—এই কর্ণ তো একদা তার হবার কথা ছিল! স্বয়ংবর সভায় সে তো তার বীর্যবত্তার পরিচয় দিতে উদ্যত হয়েছিল! ও যে

সত্যি সত্যি একজন মহাবীর, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে। এরকম একজন প্রবলপ্রতাপী মানুষ তার স্বামী হলে দোষের কী ছিল? কিন্তু সেদিন তার যে কী হয়েছিল! হীনজাতের দোহাই দিয়ে কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল সে। আর কী আশ্চর্য! সেই হীনজাতের কর্ণের জন্য হৃদয়ে এত তোলপাড় হচ্ছে আজ! আহা, কর্ণকেও যদি স্বামী হিসেবে পাওয়া যেত! পাঁচজনের জায়গায় না হয় ছয়জন হতো! যদি কর্ণকে হৃদয়ের কাছে পাওয়া যেত, পরম তৃপ্তি পাওয়া যেত!

এরকম ভাবনা দ্রৌপদীর ভেতরটাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে, আনমনা করে তোলে তাকে। পঞ্চস্বামীর সামনে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র বলে মনে হয়। নিজেকে সংযত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যায় দ্রৌপদী। কিন্তু অবুঝ মন বিবেকের কথা শোনে না।

স্বামীদের সঙ্গে, পুত্রদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে থাকে দ্রৌপদী।

যুদ্ধ একসময় শেষ হয়।

পাণ্ডবদের জয় হয়।

কিছুদিন রাজ্যশাসনের পর পাণ্ডবরা স্বর্গযাত্রা করে। সঙ্গে যায় দ্রৌপদী।

চার

অহনা ভেতরে ভেতরে অবিন্যস্ত হতে থাকে। একধরনের বিবর্ণ বিপর্যস্ততা অহনাকে বিধ্বস্ত করতে থাকে। রক্তক্ষরণ হতে থাকে অহনার মস্তিষ্কে, হৃদয়ে।

কল্যাণের সঙ্গে ঘর করছে অহনা। কল্যাণ তাকে গভীরভাবে ভালোবাসে। তার আচরণে-সোহাগে কোনো খামতি নেই। তারপরও অহনার অন্তরে কীসের যেন অভাব! কীসের অভাব, কার অভাব? কে সে? সে কি প্রভাস? তার প্রথমদেখা পুরুষ, প্রথম হাতধরা পুরুষ!

সেই বিকেলে একপর্যায়ে হাতটা ধরেছিল প্রভাস। মা এনে তার ঘরে বসিয়ে দিয়েছিলেন দুজনকে। বলেছিলেন, তোমরা কথা বলো। আমি একটু ওদিকটা সামলাই। বলে মা সরে গিয়েছিল ঘর থেকে। কী সুন্দর মিষ্টি করে কথা বলেছিল প্রভাস! বলেছিল, খুব ধনী নই আমরা, তবে তুমি অসুখে থাকবে না। তোমাকে আজীবন ভালোবেসে যাব আমি। বলে অহনার ডান হাতটা নিজের দিকে টেনে নিয়েছিল প্রভাস। সেই স্পর্শ, এই এতদিন পরেও অহনার হাতে লেগে আছে। মাঝে মাঝে হাত বোলায় সেই স্পর্শিত অংশে।

কল্যাণ তাকে পরম সুখে রেখেছে। শ্বশুর-শাশুড়ির তুলনা নেই। তার পরও মনের মধ্যে খোঁচাখুঁচি। মাঝেমধ্যে মনে হয়—তার স্বামী কল্যাণ না হয়ে প্রভাস হলেই ভালো হতো। কী দারুণ শান্ত স্বভাব প্রভাসের! কখনো উঁচু গলা শোনা যায় না তার! পাড়াতো ননদিনী বলে, প্রভাসদার তুলনা নেই। পাড়ার সবাই মান্যিগণ্যি করে তাকে। স্বভাবচরিত্র খুবই ভালো প্রভাসদার। কল্যাণও ভালো। তবে অল্পতে রেগে যায় খুব। তখন তার হুঁশ থাকে না। চিৎকার চেঁচামেচি করে। আহা, প্রভাস যদি তার হতো, কতই-না ভালো হতো!

পাঁচ

পরীক্ষিতের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে পাণ্ডবরা মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করে। তারা হিমালয়, বালুকার্ণব, মেরুপর্বত পার হতে থাকে।

একদিন পথে দ্রৌপদী পতিত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে।

ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করে, 'দ্রৌপদীর অকালমৃত্যুর কারণ কী দাদা?'

যুধিষ্ঠির বলে, 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর পক্ষপাতিত্ব ছিল। তাছাড়া...।'

'তাছাড়া কী দাদা?' ভীম আবার জিজ্ঞেস করে।

'কর্ণের প্রতিও প্রচণ্ড দুর্বলতা পোষণ করত দ্রৌপদী, মনে মনে। এটা অপরাধ। এই অপরাধেও দ্রৌপদীর অকালে মৃত্যু হলো।' ধীরস্থির কণ্ঠে বলে গেল যুধিষ্ঠির।

ভীম স্তম্ভিত।

ছয়

অহনা আসন্নপ্রসবা। গত কদিন ধরে খুব কষ্ট পাচ্ছে। ম্যাটারনিটিতে ভর্তি করানো হয়েছে তাকে।

ডাক্তার বলেছেন—ক্রিটিকেল অবস্থা। দুজনকে বাঁচানো যাবে না। মায়ের অবস্থা সন্তানের চেয়ে খারাপ।

অহনা মাঝেমধ্যে জ্ঞান হারাচ্ছে।

কল্যাণকে একা পেয়ে অহনা বলল, 'আমি বাঁচব না কল্যাণ। মরার আগে আমি আমার একটা ইচ্ছে পূরণ করতে চাই।'

'কী ইচ্ছে? কী ইচ্ছে তোমার? আমাকে বলো।' কল্যাণ উদগ্রীব কণ্ঠে বলে।

অহনা কোঁকানো গলায় বলে, 'আমার বাসনা পূরণ করা তোমার পক্ষে কঠিন হবে।'

প্রবল আগ্রহ নিয়ে কল্যাণ বলে, 'বলো তুমি। যত কঠিনই হোক, তোমার ইচ্ছা পূরণ করব আমি।'

অহনা নিশ্চুপ হয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলে না। হয়তো কথা বলার শক্তি ফুরিয়ে গেছে তার অথবা বাসনার কথাটা বলার জন্য শক্তি সঞ্চয় করছে সে।

এই সময় কল্যাণ অহনার হাত ঝাঁকিয়ে আবার বলে ওঠে, 'অহনা, তুমি আমার স্ত্রী। তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণের দায়িত্ব আমার। বলো, তোমার কী বাসনা?'

'আমি মরার আগে প্রভাসকে একনজর দেখতে চাই।' শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে অহনা।

যমুনাজলে বিবর সন্ধান

যমুনাজলে নৌকাটি ভাসছে।

তীর ঘেঁষেই নৌকাটি। একগাছি শুকনো লতা দিয়ে তীরলগ্ন একটি গাছের শিকড়ের সঙ্গে নৌকাটি বাঁধা। একে নৌকা না বলে ডিঙি বলা ভালো। আকারে তেমন বড় নয়। চার-পাঁচজন আরোহী বসতে পারে মাত্র। কিশোরী-নৌকাটি আপন ছন্দে নাচছে। এদিককার যমুনাজল নীল। জলতরঙ্গগুলো ছলাৎ ছলাৎ করে তীরভূমিতে আছড়ে পড়ছে। আছড়ে পড়ার শব্দ ঈষদুচ্চকিত। মৃদু তরঙ্গাঘাতেই নৌকাটি অল্প অল্প দুলছে।

নৌকার পাছার দিকে হাল ধরে বসে আছে এক কন্যা। উদ্ভিন্ন যৌবনা। রমণীর সকল রমণীয়তা তার সর্বাঙ্গ জুড়ে। যমুনাজলের মতোই ঘননীল তার চোখ দুটো। কন্যাটি অতিশয় সুন্দরী। মানুষ যে অর্থে সুন্দরী নারী বোঝে, এই নারী সে অর্থে সুন্দরী নয়। তার শরীরে গৌরবর্ণের আভাসটুকুও নেই। গৌরবর্ণীয় দুর্বলতাটুকু সৌন্দর্য নির্ধারণের মাপকাটি হতে পারে না। যুবতিটির গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। সৌন্দর্য সম্পর্কে আদি-বিশ্বাসটুকু মন থেকে ঝেড়ে ফেলে কন্যাটির দিকে তাকালে যেকোনো বয়সের পুরুষের দৃষ্টি আটকে থাকবে ওই নারীর দেহে। তাকে দেখে মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহ চঞ্চল হয়ে উঠবেই।

নৌকায় বসা যুবতিটির দৃষ্টি অরণ্যবাহী পথের দিকে প্রসারিত। যদি কেউ আসে! এই ঘাটে আসার ওটাই একমাত্র পথ। এই নির্জন ঘাটে কারও জন্য অপেক্ষা করছে সে। এই অপেক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনের।

কিন্তু দুপুর গড়িয়ে গেল, এখনো পর্যন্ত কেউ এলো না।

সন্ধ্যা নামতে এখনো দেরি আছে। গোধূলির হলদে আলো সবেমাত্র নীল যমুনাজলের ওপর ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। শুধু যমুনাজলে কেন, সবুজ অরণ্যভূমির ওপর, পাহাড় থেকে সাপের মতো আঁকাবাঁকাভাবে নেমে আসা পথের ওপর, সর্বোপরি নৌকায় বসে থাকা রমণীর চিকনকালো দেহের ওপর গোধূলি তার আপন রং ছড়িয়ে যাচ্ছে।

নৌকার প্রান্তভাগে স্থির হয়ে বসা নারীটিকে চিত্রার্পিত মূর্তির মতো মনে হচ্ছে। তার কেশরাশি মাথার ওপরে চূড়া করে বাঁধা। দেখে মনে হচ্ছে,

ঘোর অমাবস্যা ওই কেশরাশির মধ্যে বন্দি হয়ে আছে। তার ঈষৎ ঝুলানো ওষ্ঠাধরে এমন একটা হাসি মৃদু খেলা করছে, যা দেখলে সাধারণ মানুষ তো কোন ছার, মুনিঋষিরও ধ্যানীমন টলে যাবে।

রমণীর পুরুষ্টু স্তনযুগল ছোট একটি বস্ত্রখণ্ডে ঢাকা। ওই বস্ত্রখণ্ডটি পৃষ্ঠদেশের একটি সূত্রগ্রন্থির সঙ্গে নিবদ্ধ। নারীটির অধমাঙ্গের বস্ত্র প্রয়োজনের তুলনায় কম। উরু ছাড়িয়ে সামান্য নিচে এসে বস্ত্রটির দৈর্ঘ্য ফুরিয়ে গেছে। নৌকাটির পশ্চাদ্ভাগে পা দুটোকে সামান্য ছড়িয়ে দিয়ে বসেছে সে। তাতে তার উরু, মোহনীয় চরণ দুটো প্রায় অনাবৃত ও দৃশ্যমান। নারীটির এই অনাবরণ দেহাংশ চতুর্দিকের পরিবেশে লাবণ্যের সঞ্চার করছে। ইচ্ছে করে নারীটি এরকম সাজপোশাক পরেনি বা এরকম লোভনীয় ভাবে বসেনি। এটা তার সমাজে স্বাভাবিক এবং প্রচলিত।

তার স্বল্প বসন, তার অনাবৃত দেহ তার সমাজে যতই স্বাভাবিক হোক না কেন, অন্য সমাজের মানুষের কাছে তা অসহনীয়। নারীটির সমাজে এটা একটা সহজ সরল আচার, কিন্তু তার সমাজবহির্ভুত মানুষের কাছে রিরংসা উদ্রেককারী। নীল ঊর্মিমুখর যমুনার জল, তার ওপর মোহিনী এই যুবতি, দুটোকে একসঙ্গে অবলোকন করে যেকোনো ঋষি তাঁর সারাজীবনের বৈরাগ্যসাধনা বিসর্জন দিতে তিলার্ধ কাল বিলম্ব করবেন না। এই নারীটির অধিকার পেতে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দ্বিধা করবেন না তিনি।

হঠাৎ নদী-তীরবর্তী পাহাড়ের সর্পিল পথ বেয়ে একজন মানুষকে দ্রুত নেমে আসতে দেখা গেল। পুরুষটি দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত, জটাজুটধারী। নৌকাটির কাছে এলেন তিনি। শরীরটা শীর্ণ। দীর্ঘদিনের বৈরাগ্যসাধনার চিহ্ন সমস্ত দেহজুড়ে। চেহারায় ক্লান্তির প্রকাশ দেখা গেলেও চোখ দুটো তাঁর উজ্জ্বল। তাঁর সেই উজ্জ্বল চোখে অর্জিত জ্ঞানের নিবিড় উপস্থিতি লক্ষ্যযোগ্য। একটা নির্দিষ্ট তপাশ্রমে বহু বছর সাধনা শেষ করে হয়তো তিনি তীর্থদর্শনে বের হয়েছেন। হয়তো যমুনা পার হয়ে মথুরা বা শূরসেন রাজ্যের কোনো দেবক্ষেত্র দর্শনে যাবেন। অথবা যমুনার ওপারের মৎস্যদেশের কোনো তীর্থক্ষেত্র দর্শন করে নিজেকে আরও পবিত্রময় করে তুলবেন।

যমুনার এই অংশটি কিঞ্চিৎ সংকুচিত। জলধারা কম স্রোতময়। নদীর বুকজুড়ে এখানে ওখানে চর। দূরের একটা চর বৃক্ষময়। ওই চরের পাশ ঘেঁষেই ওপারে যেতে হবে। এই অঞ্চল দিয়ে নদী পারাপারের জন্য লোক আসে। এদিক দিয়ে পারাপারে সময় লাগে কম, তাই নদীর এই অংশটিই পারার্থীদের পছন্দ। পরিশ্রম কম লাগে বলে নৌবাহকেরও পছন্দ এই অঞ্চলটি।

এখানে সবসময় একজন পুরুষই নৌকা পারাপার করে, আজকে তার জায়গায় বসে আছে এই উদ্ভিন্ন যৌবনা রমণীটি।

নৌকার কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালেন ঋষি। তাঁর দৃষ্টি সামনে প্রসারিত। এমনিতে ঘাটে পৌঁছতে তাঁর দেরি হয়ে গেছে ! দ্রুত পায়ে হেঁটে আসার জন্য হাঁপ ধরে গেছে তাঁর। চোখে-কপালে ক্লান্তির উপস্থিতি। আর দেহজুড়ে ক্লান্তি-অবসন্নতা তো আছেই! কিন্তু সামনে তাকিয়ে ঋষির দেহমন থেকে ত্বরিত সমস্ত ক্লিষ্টতা উধাও হয়ে গেল। তিনি দেখলেন, নিকষ কৃষ্ণবরণ রমণীটির সর্বাঙ্গ ঘিরে গোধূলির আলো এক অপূর্ব মায়ার সৃষ্টি করে চলেছে। যমুনাজলকে উদ্ভাসিত করে নারীটির নগ্ন পায়ে অস্তরাগ লুটোপুটি খাচ্ছে।

ঋষি ক্ষণকাল তার অতীতকে ভুললেন। তিনি নদীর সৌন্দর্যে, পর্বত-অরণ্যের রূপে এবং নৌকায় বসা নারীটির অঙ্গসৌষ্ঠবে মোহিত হলেন। এক অবর্ণনীয় শিহরণ তাঁর শিরায় উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ল। তিনি কামার্ত হলেন। এক দুর্দমনীয় আসঙ্গলিপ্সা তাঁর মনে জেগে উঠল। তিনি বিচক্ষণ। মনের কামনা মনেই চেপে রাখলেন তিনি। মানসিক বিকারকে দমন করে রাখার শক্তি তাঁর আছে। তিনি নিজের রিরংসাকে সংযত করলেন।

মুনি নারীটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সুতন্বী, তুমি কে? এখানে যে-লোকটি পারাপার করত, সে কোথায়? ও আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত নাইয়া।'

তন্বী করজোড়ে বলল, 'প্রণিপাত ঋষিবর। যিনি নৌপারাপার করতেন, তিনি আমার বাবা। বাবার বয়স হয়ে গেছে। নৌপারাপারে শক্তির প্রয়োজন। পিতা আজ শক্তিহীন। তাঁর কোনো পুত্রসন্তান নেই। তাই নৌচালানোর দায়িত্ব আমার ওপর পড়েছে। আপনি নৌকায় চরণ রাখুন।'

মুনিবর মেয়েটির গুছানো কথা শুনে মুগ্ধ হলেন। বললেন, 'বাঃ! তুমি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারো!'

বলতে বলতে নৌকায় উঠে বসলেন তিনি। মুগ্ধ চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মুনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি তন্বী?'

মেয়েটির মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল। বলল, 'আপনি তো আমার একটা নাম দিয়েই দিয়েছেন, তন্বী। ও নামেই না হয় ডাকুন আমাকে।'

'তুমি তো বেশ বুদ্ধিমতী দেখছি! আমার কথা দিয়ে আমাকেই জব্দ করলে হে!'

'অপরাধ নেবেন না মুনিবর। আমি যদি আপনার রাগের কারণ হই ক্ষমা করুন।'

মৃদু হেসে ঋষি বললেন, 'অপরাধের কিছু বলোনি তুমি। সন্ত্রস্ত হয়ো না।' একটু থেমে আবার বললেন, 'তোমার নামটি কি বলবে এবার?'

মুনিবরের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তন্বী বলল, 'সূর্যদেব পশ্চিমে একেবারে হেলে পড়েছেন। পাহাড়ের ছায়া ঘন হয়ে আসছে। অবস্থা বুঝে মনে হচ্ছে, আর কোনো পারার্থী আসবে না। তাছাড়া, আপনার হাঁটার গতি দেখে অনুমান করছি, আপনারও তাড়া আছে। যদি অনুমতি দেন, নৌকা ছাড়ি।'

'অবশ্যই অবশ্যই।' তন্বীর বক্ষদেশে একপলক চোখ বুলিয়ে ঋষি বললেন।

তন্বী এক লাফে নৌকা থেকে নামল। তার নিতম্ব দুলে উঠল। গাছের শিকড় থেকে লতাটি খুলে দিল। উপুড় হয়ে নৌকাটিকে জলের দিকে ঠেলতে উদ্যত হলো সে। এই সময় ঋষির চোখদুটো আটকে গেল তন্বীর পুষ্ট স্তনযুগলে। উপুড় হবার কারণে স্তনদুটো ভালোরকমে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল।

তন্বী নৌকায় উঠে হাল ধরল। নৌকা সামান্য এগিয়ে গেলে মেয়েটি নিচু স্বরে বলল, 'আমার নাম মৎস্যগন্ধা।'

'মৎস্যগন্ধা!' বিস্মিত চোখ মুনিবরের। 'এ কেমন নাম তোমার?'

'হ্যাঁ, আমার নাম মৎস্যগন্ধা। আমার সমস্ত শরীরজুড়ে মাছের গন্ধ। বিদ্‌ঘুটে একটা মৎস্যগন্ধ সর্বদা আমাকে ঘিরে আছে।'

নিজের অজান্তে মুনিবরের ডান হাতটা নাকের কাছে চলে এলো। বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে নাকের অগ্রভাগে একবার ডলা দিলেন। তারপর জোরে একটা শ্বাস টানলেন।

বললেন, 'কই, আমি তো কোনো মাছের গন্ধ পাচ্ছি না!'

এবার খলবল করে হেসে উঠল মৎস্যগন্ধা। হাসতে হাসতে বলল, 'অতদূরে মাছের গন্ধ পাবেন কী করে আপনি? গন্ধ তো আমার গায়ে গায়ে! যারা অতি নিকটে আসে, শুধু তারাই বুঝতে পারে আমার গায়ের দুর্গন্ধটি।'

মুনি কি এই সময় একটু লোভাতুর হয়ে উঠলেন, মৎস্যগন্ধার নিকটে যাওয়ার জন্য? বোঝার উপায় নেই। কারণ মুনি যেখানে বসে ছিলেন, সেখানেই বসে থাকলেন। তাঁর দেহ এক জায়গায় স্থির থাকলে কী হবে, মন তাঁর উড়ে গেল মৎস্যগন্ধার দেহসমীপে। দেহের চারিদিকে মধুকরের তৃষ্ণা নিয়ে মনটি তাঁর ঘুরতে লাগল।

'কী ভাবছেন মুনিবর?' মৎস্যগন্ধা জিজ্ঞেস করল।

তাঁর এই মুহূর্তের ভাবনাটি যদি মৎস্যগন্ধার কাছে ব্যক্ত করেন, তাহলে লজ্জার অন্ত থাকবে না। নিজের মধ্যে নিজের মনকে লুকালেন তিনি। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলতে চাইলেন, 'এরকম হলো কেন?'

মৎস্যগন্ধা জিজ্ঞেস করল, 'কী রকম?'

'মানে তোমার শরীর থেকে মাছের গন্ধ বের হয় কেন? স্বাভাবিক কোনো মানুষের শরীর থেকে তো মৎস্যগন্ধ বের হয় না! নিদেনপক্ষে ঘামের গন্ধ বের হয়!'

'যদি অপরাধ না ধরেন মুনিবর, আপনার পরিচয়টা কি জানতে পারি?'

এবার মুনিবরের চোখমুখ জুড়ে প্রশান্ত একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ল। বললেন, 'নিতান্ত অল্পবয়স তোমার, তাই তুমি আমাকে চিনতে পারছ না। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ আমাকে চেনে। আমি পরাশর। মহর্ষি বশিষ্ঠের পৌত্র হিসেবে, বৈদিক ঋষি হিসেবে সমগ্র পৃথিবী আমাকে চেনে।' আস্তে আস্তে বললেন পরাশর।

হালধরা অবস্থাতেই মাথা নোয়াল মৎস্যগন্ধা। বলল, 'আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত গ্রহণ করুন ঋষিবর।'

এরপর বলল, 'আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন আমার শরীর থেকে মাছের গন্ধ বের হয় কেন? এর উত্তর দেওয়ার আগে বলি, পিতার কাছে আপনার কীর্তির কথা শুনেছি। শুধু আপনাকে চোখে দেখিনি আগে।'

'হ্যাঁ, তাই তো! কেন বের হয়?' পরাশর মৎস্যগন্ধার শেষের কথাকে কানে না তুলে বললেন।

'আমার যে স্বাভাবিক জন্ম নয়!'

'মানে!'

'মানে আমার জন্ম কোনো নারীর গর্ভে হয়নি। অদ্রিকা নামের এক মৎস্যার গর্ভে আমার বড় হয়ে ওঠা।'

নৌকাটি সামনের দিকে এগোতে থাকল। আস্তে আস্তে বৈঠা চালাতে চালাতে মৎস্যগন্ধা তার জন্ম-ইতিহাস বলে গেল।

চেদিরাজ উপরিচরবসু। মহিষী গিরিকা। পিতৃযজ্ঞের কারণে মৃগয়ায় যেতে হলো রাজাকে। কিন্তু মৃগয়ায় মন বসে না রাজার। প্রাসাদে অপেক্ষমান সুন্দরী গিরিকার কথাই বারবার মনে পড়ছে তাঁর। রাজা রতিলিপ্সু হয়ে পড়লেন। কিন্তু স্ত্রী তো স্পর্শের বাইরে, রাজপ্রাসাদে। মন সংযমের বাঁধ মানল না। রেতপাত হলো রাজার। সেই বীর্য পত্রপুটে করে বাজপাখির পায়ে বেঁধে মহিষীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন রাজা। আকাশপথে সেই পাখি অন্য একটা বাজপাখি দ্বারা আক্রান্ত হলো। যমুনাজলে সেই শুক্রাণু পতিত হলো। শাপগ্রস্ত মৎস্যরূপী স্বর্গঅপ্সরা অদ্রিকা সেই বীর্য খেয়ে গর্ভবতী হলো। কালক্রমে সেই মৎস্য জেলেদের জালে ধরা পড়ল। ধীবররা সেই মৎস্যকে কাটতে গেলে পেট থেকে দুটো শিশু বেরিয়ে এলো। একটি কন্যা, অন্যটি পুত্র। রাজা উপরিচরের কাছে খবর গেলে তিনি পুত্রটিকে সাদরে গ্রহণ করলেন। কন্যাটিকে ত্যাগ করলেন।

গভীর আগ্রহে পরাশর জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর?'

'সেই পরিত্যক্ত কন্যাটিই আমি। মেয়ে বলে পিতার কাছে গৃহীত হলাম না। পিতা হেলায় দাশরাজার কাছে আমাকে দিয়ে দিলেন। বললেন, দেখ ধীবররাজ, মেয়েটাকে বাঁচাতে পারো কিনা।'

পরাশরের বিস্ময়ের শেষ নেই। তিনি বললেন, 'তারপর!'

'ধীবররাজ আমাকে সাদরে কোলে তুলে নিলেন। গভীর বাৎসল্যে আমাকে বড় করে তুললেন এই জেলেদম্পতি। নিজেরা খেয়ে না-খেয়ে আমার ভরণপোষণ করে যেতে লাগলেন।'

'খেয়ে না-খেয়ে কেন? এই না বললে ধীবররাজ! মানে তোমার পালকপিতা রাজা! তার অভাব কীসের?' বললেন ঋষি।

এবার খিলখিল করে হেসে উঠল মৎস্যগন্ধা। বলল, 'আমার বাবা নামে রাজা, আসলে সাধারণ একজন জেলে। হ্যাঁ, অন্যান্য জেলের চেয়ে তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল। তাই পাড়াপড়শিরা তাঁকে দাশরাজা বলে সম্বোধন করত। রাজা বলতে আপনারা যা বোঝেন, আমার বাবা সেরকম ছিলেন না। দরিদ্র জেলেদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে উচ্চবিত্তের ছিলেন।'

'তাও যদি হয়, তারপরও তো খাওয়াপরার অভাব হবার কথা নয় তোমার বাবার!' পরাশর বললেন।

মৎস্যগন্ধা করুণ কণ্ঠে বলল, 'যথার্থ বলেছেন ঋষি। অভাব ছিল না বাবার ঘরে। কিন্তু একটা দুর্ঘটনায় অভাবে পড়তে হলো তাঁকে।'

'দুর্ঘটনা!' বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন মুনি।

'হ্যাঁ, দুর্ঘটনা। একবার প্রবল বৃষ্টিপাত হলো এই অঞ্চলে। আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন পাহাড়ি অঞ্চল এটা। বৃষ্টির দরুন প্রবল ঢল নামল পাহাড় থেকে। শান্ত যমুনা রাক্ষুসি যমুনা হয়ে উঠল। প্রচুর জল, প্রবল স্রোত। ওই সময় যমুনায় বাবার দু'দুটো নৌকা মাছ ধরায় ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ করালগ্রাসী বন্যার তোড়ে নৌকা-জাল যে কোথায় ভেসে গেল, হদিস মিলল না! বাবা কোনোরকমে প্রাণে বাঁচলেন। সঙ্গী জেলেদের কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না! সেই থেকে বাবা দিন এনে দিন খাওয়া মানুষ। বেঁচে থাকার জন্য এই পারানির কাজ। আগেই বলেছি আপনাকে, বাবা এখন বয়োবৃদ্ধ। শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারেন না এখন। তাই আমাকে করতে হচ্ছে নৌবাহনের কাজ।' একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো মৎস্যগন্ধার বুক চিরে।

এ তো প্রকৃতির অভিশাপ। প্রকৃতির অভিশাপে মৎস্যগন্ধার পিতা সর্বস্বান্ত হয়েছে। তাতে মানুষের হাত নেই। সব হারানোর কাহিনি শুনে মনে বেদনা জাগতে পারে শুধু। পরাশরের মনেও তা-ই জাগল। পরাশর ক্রোধ এবং বেদনাকে সংবরণ করতে জানেন। খেয়াতরীতে বসে

মৎস্যগন্ধার দিকে তাকিয়ে তাঁর বেদনা প্রশমিত হলো। বেদনার পর জাগল বাৎসল্য। বাৎসল্যের জায়গায় ধীরে ধীরে এক অপূর্বস্বাদিত শিহরণ উৎপন্ন হতে শুরু করল। মুনি মৎস্যগন্ধার যৌবনোদ্ভেদ নিরীক্ষণ করে পুলকিত হতে থাকলেন। মৎস্যগন্ধার কালো দেহরূপের মধ্যে কমনীয় আলোর সন্ধান পেলেন।

পরাশর বললেন, 'আমি তোমার দিনশেষের শেষযাত্রী বাসবী। আমাকে একটু দ্রুত ওপারে নিয়ে চলো।'

মৎস্যগন্ধা চকিতে চোখ তুলে তাকাল পরাশর মুনির দিকে। বাসবী কেন? মুনির মুখে এই অশ্রুতপূর্ব সম্বোধনটি শুনে মৎস্যগন্ধার হাতের বৈঠাখানি থেমে গেল। বাসবী নামের রহস্য সে জানে। এই সম্বোধন ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত। অদ্ভুত এক ভঙ্গি করে সে মুনির দিকে তাকাল। এই ভঙ্গিমায় মৎস্যগন্ধার কোনো অভিসন্ধি নেই। এটা তার সহজাত ভঙ্গিমা। শুধু মুনির দিকে কেন, সবার দিকে বিস্ময়ের সময় ঠিক এই ভঙ্গিতে তাকায় সে। মুনি ভাবলেন, অন্যকিছু। কৃষ্ণা রমণীর শারীরিক বিভঙ্গের দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তিনি।

এইসময় মৎস্যগন্ধা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'নারী আমি। আমার পেশিতে জোরই-বা কতটুকু! দ্রুত বাইতে তো শক্তি লাগে!'

পরাশর মৎস্যগন্ধার পেলব বাহুর দিকে চোখ রেখে বললেন, 'তুমি আমাকে ভুল বোঝ না স্নিগ্ধা। ওপারে যাবার তাড়া আমার। দ্রুত সন্ধ্যা নামছে। তাই তাড়া দিয়েছি আমি। ভুল হয়ে গেছে আমার। তুমি তোমার সাধ্যমতো বাও।'

মৎস্যগন্ধা ভাবল—যে পরাশর মুনির ক্রোধ জগদ্বিখ্যাত, যিনি মিষ্টি কথায় জগৎ ভোলাতে শিখেননি, বেদ-পুরাণ-বেদান্ত পড়ে পড়ে যার ভেতর থেকে লোকজ আবেগ তিরোহিত হয়ে গেছে, যিনি ঈশ্বর সাধনাকেই জীবনের সারার্থ বলে মনে করেন, তাঁর কণ্ঠে একী উচ্চারণ! বাসবী, স্নিগ্ধা, ভুল বোঝ না—এসব কথাবার্তা!

কোনো রহস্য? কোনো উদ্দেশ্য?

অনুসন্ধিৎসু চোখে পরাশরের দিকে তাকাল মৎস্যগন্ধা। দেখল—মুনিবরের চোখে কী রকম একটা গাঢ় আভা! ও-চোখে ক্রোধ নেই, বিরক্তি নেই, প্রথম দেখার ক্লান্তি নেই। কী রকম যেন অদ্ভুত এক চাহনি! সেই চাহনির অর্থ কি মৎস্যগন্ধা অনুমান করতে পারছে? মৎস্যগন্ধা নারী। সুতরাং এরকম পুরুষ-চাহনির অর্থ যে সে একেবারে বুঝতে পারছে না, এমন নয়। সে লজ্জায় মাথা নিচু করল। মৃদু একটা কম্পন সে নিজের মধ্যে অনুভব করতে লাগল।

এই সময় পরাশরের স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠ মৎস্যগন্ধার কানে ভেসে এলো, 'বাসবী, আমি তোমার সঙ্গে মিলন প্রার্থনা করছি।'

বিভ্রান্ত চোখে মৎস্যগন্ধা মুনিবর পরাশরের দিকে তাকাল। তাঁর হঠাৎ প্রস্তাবে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল সে। মুনির প্রস্তাবটি বজ্রাঘাত তুল্য না নিতান্ত শ্রুতিসুখকর, বুঝতে পারল না মৎস্যগন্ধা। একটা অব্যক্ত বিভোরতা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। তার যে এই এত বয়স হলো, কোনো পুরুষ তাকে এরকম করে প্রার্থনা করেনি আগে। তার দেহের ওপর যৌবন আলো ফেলেছে, দিনে দিনে তার নারী-অঙ্গগুলো পুষ্ট হয়ে উঠেছে, কিন্তু কেউ তার দিকে তেমন করে ফিরে তাকায়নি। বলেনি, 'মৎস্যগন্ধা, তুমি অতীব সুন্দরী, আমি তোমার সঙ্গ চাই।'

চাইবে কী করে? সে তো নিতান্ত কালাকোলা এক ধীবরকন্যা, তার শরীর জুড়ে যে তীব্র মৎস্যগন্ধ! এই মুনি যতই হাড্ডিডসার হোন, যত অধিক হোক তাঁর বয়স, তাঁকে তো যথামর্যাদায় প্রার্থনা করল! এ তো তার পরম পাওয়া!

হঠাৎ জোরে মাথা ঝাঁকাল মৎস্যগন্ধা। ছিঃ! এসব কী ভাবছে সে? সে না দাশরাজার কন্যা? তার না সমাজ আছে? তাকে ঘিরে না তার মা-বাবার স্বপ্ন-সাধ আছে? সর্বোপরি আছে তার কুমারিত্ব! মুনি-সংসর্গে তার কুমারিত্ব বিসর্জিত হবে। গোটাটা জীবন অশুচিময়তার মধ্যে যাপন করে যেতে হবে তাকে। এই মুনি তো তাকে চিরসঙ্গিনী করে নিয়ে যাবেন না। রতিক্রিয়া সম্পন্ন করে হেলায় ফেলে চলে যাবেন। মুনির কাছে সে ক্ষণিক-উত্তেজনার ব্যবহার্য বস্তু ছাড়া তো বাড়তি কিছুই নয়? মুনির ক্ষণিক চিত্তচাঞ্চল্যে ধরা দেওয়া তার উচিত হবে না। কিন্তু ধরা না দিলে মুনি যদি অভিশাপ দেন? যদি 'নরকের কীট হয়ে পরবর্তীকালটা কাটাও তুমি'—এরকম কিছু একটা অভিশাপ দেন? কী হবে তখন?

এইসময় পরাশরের কণ্ঠ আবার শুনতে পেল সে, 'তুমি দ্বিধায় পড়েছ, তাই না মৎস্যগন্ধা? একদিকে তোমার কুমারিত্ব, তোমার সমাজ, তোমার পিতামাতা, তোমার ভবিষ্যৎ জীবন, অন্যদিকে মুনির প্রার্থনা। সেই প্রার্থনার সঙ্গে তোমার শিহরণ বাসনাও যুক্ত। কোনটাকে মেনে নেবে তুমি? তোমার কুমারিত্বকে মূল্য দেবে, না আমার প্রার্থনাকে গ্রহণ করবে? আমি বলি কি...।' অর্ধপথে কথা থামিয়ে দিলেন মুনি।

চকিতে পরাশরের দিকে তাকাল মৎস্যগন্ধা। কোনো কথা বলল না।

'বলি, আমাকে একটা পুত্র দান করো তুমি। তোমার মাধ্যমে আমি আমার পিতৃঋণ শোধ করতে চাই। যুগান্তরে বিস্তৃত হতে চাই।' রমণীর সঙ্গে শারীরিক মিলনের পূর্বে পুরুষের মধ্যে যে বাঁধভাঙা কামনা উদগ্র হয়ে ওঠে, সেরকম কোনো চিহ্ন পরাশরের দেহভঙ্গিতে বা কথায় নেই।

মৎস্যগন্ধা নিজের ভেতরে চোখ রাখল। তার ভেতরটা কী বলে? তার ষোড়শীহৃদয় বলছে—অনাস্বাদিত এই স্বাদ গ্রহণ করতে তোমার আপত্তি কেন মৎস্যগন্ধা? অবর্ণনীয় নিবিড় শিহরণ এতে। এক গহিন-গভীর আনন্দ জড়িয়ে আছে এই শিহরণে। ফিরিয়ে দিয়ো না তুমি মুনিকে। গ্রহণ করো তাঁকে। তাতে মুনির তৃপ্তি, তোমার পরমানন্দ।

'কিন্তু আমার কুমারিত্ব?' মনকে প্রশ্ন করল সে। সেই প্রশ্ন গলা দিয়ে শব্দ হয়ে বেরিয়ে এলো। মুনির শ্রবণেন্দ্রিয় পর্যন্ত পৌঁছে গেল মৎস্যগন্ধার প্রশ্ন।

পরাশর মনে করলেন—প্রশ্নটি তাঁকেই করা হয়েছে। স্মিত কণ্ঠে বললেন, 'তুমি ভয় পেয়ো না নারী। আমার আশীর্বাদে তোমার কুমারিত্ব অটুট থাকবে। সন্তান প্রসবের কোনো চিহ্ন তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে থাকবে না।'

'তা কী করে হয়! সন্তান হবে অথচ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাপূর্ব থাকবে! আপনার আসঙ্গলিপ্সা মিটাব অথচ আমার কুমারিত্ব বজায় থাকবে?' লজ্জার মাথা খেয়ে প্রশ্নগুলো করল মৎস্যগন্ধা।

'ঋষি আমি। বশিষ্ঠ আমার পিতামহ। আমি আমার ঋষিত্বের দোহাই দিয়ে বলছি—আমার আশীর্বাদে তোমার কুমারিত্ব যথাযথ থাকবে। আমার সঙ্গে মিলনের পরও তুমি অপবিত্র হবে না। শুধু তাই নয়...।' বসা থেকে উঠতে উঠতে পরাশর বললেন, 'শুধু তাই নয়, আমাকে তৃপ্তি দেওয়ার ফলে তোমার ভবিষ্য-জীবন রাজকীয় হবে।'

'রাজকীয় হবে!' মৎস্যগন্ধার অবিশ্বাসী কণ্ঠ।

'হ্যাঁ, রাজকীয় হবে। এই ভারতবর্ষের বিখ্যাত এক রাজার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। বিপুল মর্যাদায় সেই রাজা তোমাকে প্রধান মহিষী করে তার রাজপ্রাসাদের নিয়ে যাবে।' মৎস্যগন্ধার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতে বসতে পরাশর বললেন।

মৎস্যগন্ধা সংকুচিত হয়ে নৌকার কাছা ঘেঁষে বসল। বলল, 'আমি নিম্নবর্ণের সামান্য এক নারী। আপনি ব্রাহ্মণ, সমাজে নমস্য। একজন দাশনারীতে উপগত হওয়া আপনার শোভা পায় না।'

'বাসনার কাছে উঁচু আর নিচু বলে কিছু নেই। তোমাকে আমার বাসনা পূরণের অনুষঙ্গ বলে মনে হয়েছে, তাই তোমাকে কামনা করছি। তুমি ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের কথা বললে। শাস্ত্রে আছে—ব্রাহ্মণ যে কোনো বর্ণের নারীতে উপগত হতে পারে। তুমি আমাকে বিমুখ করো না বাসবী।' মৎস্যগন্ধাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরতে ধরতে বললেন পরাশর।

মৎস্যগন্ধা শেষ চেষ্টা করল। মুনির জড়িয়ে ধরা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'মৎস্যগন্ধা আমি। আমার সমস্ত শরীর জুড়ে মাছের উৎকট গন্ধ। আমার সঙ্গে মিলনে আপনার ব্রাহ্মণত্ব কলুষিত হবে।'

এবার অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন পরাশর। বললেন, 'ব্রাহ্মণত্ব এত ঠুনকো জিনিস নয় যে, তোমার মতো এক নারীর সান্নিধ্যে তা কলুষিত হবে! তুমি নির্বিঘ্ন থাকো।'

তারপর কামাসক্ত চোখে মৎস্যগন্ধার দিকে তাকিয়ে পরাশর বললেন, 'আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার শরীরে আর মাছের গন্ধ থাকবে না। আজ থেকে তোমার শরীর থেকে পুষ্পগন্ধ বের হবে। যোজনপথ দূর পর্যন্ত তোমার শরীরের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়বে। আজ থেকে তুমি পুষ্পগন্ধা।'

'পুষ্পগন্ধা! যোজন পথ দূর থেকে!' মৎস্যগন্ধার গলা দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে এলো।

'আমার সঙ্গে মিলনে তোমার কোনো পাপ হবে না। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে সত্যবতী নামে খ্যাতি লাভ করবে তুমি।' বলতে বলতে মৎস্যগন্ধাকে জাপটে ধরলেন পরাশর।

নৌকার অপরিসর পাটাতনে মৎস্যগন্ধাকে শুইয়ে দিলেন।

মৎস্যগন্ধা নিজেকে মুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাল।

কিন্তু ব্রাহ্মণ্যপৌরুষের সঙ্গে একজন কৈবর্তনারী পেরে উঠবে কেন?

স্রোতের টানে এবং বাতাসের তাড়নায় নৌকাটি একটা সময়ে ওপারে ভিড়ল। মৎস্যগন্ধার দিকে একপলক তাকিয়ে নদীপারে পা রাখলেন পরাশর। যাওয়ার আগে নৌকাটিকে মাঝ-যমুনার দিকে ঠেলে দিলেন।

নৌকার পাটাতনে চিত হয়ে শুয়ে আছে মৎস্যগন্ধা। নিষ্পলক চোখ দুটি ঊর্ধ্বাকাশে স্থির।

আঁধার ঘনায়মান। আকাশের এদিক থেকে ওদিকে পাখিরা উড়ে যাচ্ছে।

নৌকাটি যমুনাজলে বৃত্তাকারে ঘুরে যাচ্ছে।

সহোদর

'কী পেলে যুধিষ্ঠির?'

'বুঝতে পারলাম না মা।'

'যুদ্ধশেষে কী পেলে তুমি?'

'জয় পেয়েছি মা। অন্যায়কে নির্মূল করতে পেরেছি।'

'এই জয়ে কি সুখ আছে? আনন্দিত হয়েছ?'

'কোন জয়ে আনন্দোল্লাস থাকে না মা?'

'যে জয়ে আত্মীয়ের রক্ত মিশে থাকে না। তোমাদের এই জয়ে আত্মীয়-পরমাত্মীয়ের রক্ত লেগে আছে।'

'দুর্যোধনদের যদি জয় হতো, সেই জয় আমাদের মৃতদেহের বিনিময়ে হতো।'

'তাদের বিজয় এত অগণন নিকটজনের রক্তে স্নাত হতো না।'

'তারা দুরাচারী মা। অন্যায়কারী তারা। হেন দুষ্কর্ম নেই, যা দুর্যোধন-দুঃশাসনরা করেনি।'

'কারা বেশি দুষ্কৃতকারী? তোমরা না কুরুরা?'

'ওরা মা, ওরাই দুষ্কৃতকারী।'

'মিথ্যে। মিথ্যেবাদী তুমি যুধিষ্ঠির! আর তোমার নিকটে ওই যে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছে উদাসীন ভঙ্গিতে, ও হলো সকল দুষ্কর্মের প্রণোদনাকারী।'

'তুমি ঠিক বলছ না মা। কৃষ্ণ আমাদের সুহৃদ, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কৃষ্ণ, আমি, আমার চার ভাই মিলে অন্যায়কে ঝেঁটিয়ে ভারতবর্ষ থেকে দূর করেছি।'

'অজুর্নের কথা বলতে চাইছ তুমি নিশ্চয়ই। ওকে তো ভুবনখ্যাত ধনুর্ধর বলো তোমরা, তাই না?'

'এটা আজ জগৎ-স্বীকৃত সত্য মা।'

'সেই জগৎ-স্বীকৃত অর্জুন কী করেছে? দ্রোণাচার্যকে হত্যা করিয়েছে।' তারপর অর্জুনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে কুন্তী বললেন, "শিক্ষাগুরু তো পিতার সমান, তাই-না অর্জুন? সেই পিতৃসম দ্রোণাচার্যকে মিথ্যে সংবাদে হতমান

করেছ, বাণে বাণে জর্জরিত করেছ। হতমান, নিরস্ত্র গুরুর মুণ্ডচ্ছেদের জন্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে লেলিয়ে দিয়েছ। দাওনি অর্জুন? মাথা নিচু করছ কেন? ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে 'অশ্বত্থামা হত, ইতি গজঃ' বলাওনি?"

'উনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মা। আমরা নিরুপায় ছিলাম। তাঁকে নিধন করার পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না।' ইতস্তত কণ্ঠে বলল অর্জুন।

'তাই বলে ছলনায় হত্যা করা! যে আচার্যের পায়ের কাছে বসে অস্ত্রবিদ্যা শিখলে, তাঁর মাথা কেটে নিলে? ছিঃ! কোন সুনীতির বলে এই দুষ্কর্ম করলে তোমরা? আর কর্ণ! কর্ণকে কী নির্মমভাবে হত্যা করলে তোমরা, যুধিষ্ঠির! অর্জুন, কী করলে তুমি! কৃষ্ণের প্ররোচনায় মহাবীর কর্ণকে কী বীভৎসভাবে হত্যা করলে অর্জুন! ও মা গো...!' হুড়মুড় করে মাটিতে ভেঙে পড়লেন কুন্তী। তাঁর দুচোখ থেকে অবিরত অশ্রু গড়াতে লাগল।

আঠারো দিনে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। আঠারো অক্ষৌহিণী যোদ্ধার রক্তে কুরুক্ষেত্রের প্রতি ইঞ্চি ভূমি ভিজে গেছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য, দুর্যোধনের নিরানব্বই জন ভাই, কুরুপক্ষের সব রথী, মহারথীরা যুদ্ধভূমিতে শয্যাগ্রহণ করেছেন। পাণ্ডবপক্ষেও কি হতাহতের সংখ্যা কম? যুধিষ্ঠিরদের শ্বশুর দ্রুপদ, শ্যালক ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমপুত্র ঘটোৎকচ, পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চপুত্র, কতজনের নাম করা যায়, সবাই নিহত হয়েছেন জীবননাশী এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। পাণ্ডবদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়ে গেছে অভিমন্যুর নিধনে। হস্তিনাপুরে বা হস্তিনাপুরের বাইরের দেশের এমন কেউ নেই, যাঁদের একজনও আত্মীয়স্বজন মারা যাননি।

একই কুরুরাজপ্রাসাদের সন্তান এই কৌরব আর পাণ্ডবরা। ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু দুই ভাই। ধৃতরাষ্ট্র বড় আর পাণ্ডু ছোট। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। তারপরও অনুজ পাণ্ডুর সিংহাসন-উদাসীনতার কারণে হস্তিনাপুরের ভারপ্রাপ্ত রাজা হয়েছেন তিনি। কুন্তী ও মাদ্রী নামের দুই স্ত্রীকে নিয়ে নগরে-অরণ্যে আনন্দের দিনরাত্রি পার করছেন পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্রের ঘরে এক কন্যা আর শতপুত্রের জন্ম হয়েছে, দৈবচক্রে পাঁচপুত্রের পিতা হয়েছেন পাণ্ডু। কালক্রমে অভিশপ্ত পাণ্ডু স্ত্রীসংসর্গ করতে গিয়ে মারা গেছেন। মাদ্রী তাঁর সঙ্গে জীবন্ত চিতায় উঠেছেন। নকুল ও সহদেব নামের দুই সতীনপুত্রকে মাতৃবাৎসল্যে লালন করলেন কুন্তী। পঞ্চপাণ্ডব আর শতভ্রাতা আচার্য দ্রোণের পাঠশালায় অস্ত্রবিদ্যার পাঠ নিল। এইটুকু পর্যন্ত জীবন চলল সহজ সরল পথে।

পরিস্থিতি সংকটাপন্ন হলো, যখন জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের যুবরাজ হিসেবে বরিত হবার সময়কাল উপস্থিত হলো। যুবরাজই দেশের পরবর্তীকালের নৃপতি। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রপুত্র; সহোদরদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। ধৃতরাষ্ট্রের অব্যবহিত পরে যুবরাজ হবার অধিকার তারই। এরকমই দাবি তার, সমর্থনও তার পক্ষের রাজন্যদের। যুধিষ্ঠির কুরু-পাণ্ডব—সব ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। হস্তিনাপুরের রাজনীতিতে বড় ভাইয়ের রাজা হবার অধিকার। যেমন হয়েছেন ধৃতরাষ্ট্র। প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডুর অনাগ্রহের কারণে রাজ্যশাসক তিনিই হয়েছেন। এদেশের সিংহাসনে যুধিষ্ঠিরের অধিকার সর্বাগ্রে গণ্য। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের দরবারে যুধিষ্ঠিরদের দাবি অগ্রাহ্য হলো। নামকাওয়াস্তে রাজ্য ভাগ করে দিলেন ধৃতরাষ্ট্র। বললেন—হস্তিনাপুরের সিংহাসনে তোমাদের পাঁচ ভাইয়ের অধিকার নেই। সেই অধিকার দুর্যোধনের। তবে তোমাদের বঞ্চিত করব না আমি। এই বলে রাজ্যের নিষ্ফলা যে ভূমি, সেই ইন্দ্রপ্রস্থের অধিকার দিলেন পাণ্ডুপুত্রদের। পাণ্ডবরা সেখানে গিয়ে রাজ্যপাট গুছিয়ে নিল। অভাবিত ঐশ্বর্যে নতুন রাজধানীকে সজ্জিত করল। রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের জৌলুস হস্তিনাপুরকে হার মানাল। ক্রোধে আর হিংসায় জ্বলে উঠল দুর্যোধন। হস্তিনাপুরের প্রাচীন বৈভবকে ম্লান করবে ইন্দ্রপ্রস্থ? কখনোই নয়। সকল ক্রোধ গিয়ে পড়ল পঞ্চপাণ্ডবের ওপর। শত্রুকে নির্মূল করতে হবে। জতুগৃহে আগুন জ্বলল। কুন্তী আর তাঁর পাঁচপুত্র কৌশলে পালালেন।

এরপর শুধু হিংসা আর ধ্বংসের কূটজাল বিস্তৃত হয়েছে হস্তিনাপুর থেকে দ্রুপদরাজ্য পর্যন্ত। এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন কৃষ্ণ থেকে ভীষ্ম, দ্রুপদ থেকে দ্রোণাচার্য পর্যন্ত। পাঁচ ভাই মিলে দ্রৌপদীকে বিয়ে করেছে। দ্রৌপদী কুরুবংশের ধ্বংসের প্রতীক হয়ে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করেছে। সূতপুত্র কর্ণ এসে যুক্ত হয়েছে দুর্যোধনশিবিরে। নৃপতি হয়েও ধৃতরাষ্ট্র নিষ্ক্রিয়, সকল ক্ষমতার আধার হয়েছে দুর্যোধন। রাজসভার নিয়ন্ত্রণক্ষমতা দুর্যোধনের কুক্ষিগত হয়েছে। দরবারের ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, বিদুর নির্বাক। ধৃতরাষ্ট্র স্নেহান্ধ। দৈহিক আর মানসিক অন্ধত্ব ধৃতরাষ্ট্রকে একেবারে নিবীর্য করে ছেড়েছে। কর্ণ দুর্যোধনের নিয়ন্ত্রণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। শকুনির কুপরামর্শ দুর্যোধনকে অধিকতর লোভী ও হিংস্র করে তুলেছে।

পাশাখেলার নামে জুয়াখেলার আসর বসেছে। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে সেই পাশাক্রীড়ায় আহ্বান জানানো হয়েছে। যুধিষ্ঠির জুয়াসক্ত। শকুনির চালে একে একে রাজ্যপাট, হাতি-ঘোড়া, ধন-ঐশ্বর্য, দাসদাসী, ভীম-অর্জুন-নকুল-সহদেব সবকিছুকে, সবাইকে হারাল। শেষ পর্যন্ত বাজি ধরল দ্রৌপদীকে। এই বাজিতেও হারল যুধিষ্ঠির। দ্রৌপদীকে রাজসভায় এনে

হেনস্তা করল দুর্যোধন-দুঃশাসন। তারপর এলো বারো বছরের বনবাস আর একবছর অজ্ঞাতবাসের বাজির পালা। শকুনি দুর্যোধনের হয়ে ঘুঁটির কূটচালে তাও জিতে নিল।

তেরো বছর পার করে যুধিষ্ঠিররা পুনরায় রাজ্যাধিকার চাইলে দুর্যোধনের সাফ উত্তর, 'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।'

কৌরব এবং পাণ্ডব—এই দুই শিবিরে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পড়ল। অধিকাংশ রাজ্য যোগ দিল কৌরবপক্ষে। সামান্য সংখ্যক রাজানুগ্রহ নিয়ে পাণ্ডবরা যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্পন্ন করল। কৌরবপক্ষের এগারো অক্ষৌহিণী আর পাণ্ডবপক্ষের সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

যুদ্ধ হলো, মৃত্যু হলো। কৌরবপক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পাণ্ডবপক্ষে বেঁচে থাকল মুষ্টিমেয় কিছু সৈন্য এবং পঞ্চপাণ্ডব। আর বেঁচে থাকলেন কৃষ্ণ। আর বেঁচে থাকলেন লক্ষ লক্ষ বিধবা নারী। তাঁদের সব হারানোর আর্তনাদে পৃথিবী প্রকম্পিত হতে থাকল।

অগ্রহায়ণের ঘোর অমাবস্যার রাতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হলো। জয়ের আনন্দ নিয়ে যুধিষ্ঠিরাদি ভাইয়েরা মা কুন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। সঙ্গে ভার্যা দ্রৌপদী। সামনে সন্তানদের দেখে কুন্তী জিজ্ঞেস করেছিলেন, যুদ্ধশেষে কী পেলে যুধিষ্ঠির?

মায়ের কথা শুনে যুধিষ্ঠির বেশটুকু অবাকই হয়েছিল। একী প্রশ্ন মায়ের! মা কী বলতে চাইছে, অনুধাবন করতে পারছে না যুধিষ্ঠির। কুরুক্ষেত্রের এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য কে বা কারা দায়ী, সেটা কি মা জানে না? দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় মা-ই তো অঝোর ধারায় কেঁদে বুক ভাসিয়েছিল! বারোটি বছর এই জননীই তো তাদের সঙ্গে বনে-অরণ্যে ঘুরে ঘুরে অনাহারে অর্ধাহারে দিন আর রাত কাটিয়েছে! কত শতবার বনের হিংস্র শ্বাপদ যে তাদেরকে আক্রমণে উদ্যত হয়েছে, সেই স্মৃতি কি মা বিস্মৃত হয়ে গেছে? বনবাস শেষে শুধু মাথা গুঁজবার জন্য কৃষ্ণ তাদের হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে মাত্র পাঁচখানি গ্রাম চেয়েছিলেন। 'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'—দুর্যোধনের এই দম্ভোক্তির কথা মার তো এত সহজে ভোলার কথা নয়! তাহলে, তাহলে মায়ের কষ্টটা কোথায়? কোথায়? আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ে তাদের বুকের কাছে টেনে নেবে, তা না, কঠিন চোখে জিজ্ঞেস করে বসল—কী পেলে যুধিষ্ঠির? যুদ্ধ তোমাদের কী এনে দিল?

মায়ের এই অভিব্যক্তির কারণ কী? কেনই-বা দোষারোপ করছে কৃষ্ণকে, অর্জুনকে? এঁরা তো যুদ্ধের নিয়ম মেনেই যুদ্ধ করেছেন। নিয়ম মানে অনিয়ম। অনিয়মই তো যুদ্ধের নিয়ম! হ্যাঁ, সে নিজে বিরাট একটা

অন্যায় করেছে বটে, পুত্র অশ্বত্থামা নিধনের মিথ্যে সংবাদ দিয়ে গুরু দ্রোণাচার্যকে নিরস্ত্র করেছে। ওই সময় বাণে বাণে ঘনঘোর বাতাবরণের সৃষ্টি করেছে অর্জুন। ফলে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহজেই আচার্যের মাথা কেটে নিয়েছে। এই জন্য সে বিবেকদংশনে দংশিত হচ্ছে অবিরত। কুরুরাজসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা তার অন্য চার ভাইয়ের মতো তাকেও হিংস্র করে তুলেছে। সবকিছু সহ্য করা যায়, দ্রৌপদীর অপমানকে সহ্য করে কী করে? এই জন্যই তো দুঃশাসনের রক্ত পান করেছে ভীম, গদাঘাতে দুর্যোধনের উরু ভেঙেছে!

মায়ের করুণ কণ্ঠ যুধিষ্ঠিরের কানে এলো। কুন্তী বলছেন, 'এই প্রাণঘাতী যুদ্ধ কি এড়ানো যেত না যুধিষ্ঠির?'

'কী করে এড়াব মা? সবকিছু মেনে নেওয়া যায়, দ্রৌপদীর অপমান-লাঞ্ছনাকে কি এড়ানো যায়? নারীর অপমান!'

ব্যঙ্গ গলায় হেসে উঠলেন কুন্তী। বললেন, 'তুমি নারীর লাঞ্ছনার কথা বলছ যুধিষ্ঠির? তোমার কাছে নারীর মূল্যায়ন কতটুকু? ভীষ্মের সঙ্গে তোমার কথোপকথনের কথা কি তুমি ভুলে গেলে?'

বিব্রত কণ্ঠে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করল, 'কোন কথোপকথনের কথা বলছ তুমি মা?'

'পিতামহ ভীষ্ম সারাজীবন বিয়ে করলেন না। গঙ্গা তাঁকে জন্ম দিয়েই অন্তর্ধান হয়েছিলেন। মা হিসেবে বা স্ত্রী হিসেবে কোনো নারীকে কাছে পাননি তিনি। তাছাড়া সত্যবতীর পিতা দাশরাজার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায় নারী-সংসর্গ থেকে নিজেকে সর্বতোভাবে বিরত রাখলেন তিনি। সেই ভীষ্মের কাছে নারীচরিত্রের ব্যাখ্যান চাইলে তুমি! কী বলে চাইলে?' কথা থামিয়ে পুত্রের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে থাকলেন কুন্তী।

বিব্রত চোখে মাথা নিচু করল যুধিষ্ঠির। অন্য ভাইয়েরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করল। দ্রৌপদী তীক্ষ্ণ চোখে শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল। প্রশ্নসংকুল চোখে কৃষ্ণ তাকিয়ে থাকলেন কুন্তীর দিকে। দূরে দাঁড়ানো অমাত্যরা উৎকর্ণ হয়ে থাকল।

যুধিষ্ঠির ম্লান মুখে মায়ের দিকে একবার তাকাল।

কুন্তী বললেন, 'তুমি পিতামহ ভীষ্মকে বলেছিলে—নারীরা সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য হিসেবে প্রতিপন্ন করে থাকে। নারীরা কোন পুরুষের প্রতি অনুরক্ত আর কোন পুরুষের প্রতি বিরক্ত, তা বোঝার উপায় নেই। কীভাবে কামিনীদেরকে পরপুরুষ-সংসর্গ থেকে নিবৃত্ত করা যায় বলুন পিতামহ, এই তো জিজ্ঞেস করেছিলে তুমি?'

যুধিষ্ঠির নিরুত্তর। ভাবছে—মা কী করে জানল এসব কথা।

কুন্তী যেন তার মনের কথা বুঝতে পারলেন। বললেন, 'দেখো যুধিষ্ঠির, রাজমাতা আমি। আমারও কিছু সংবাদ-সরবরাহকারী আছে। তোমাকে জিজ্ঞেস করি যুধিষ্ঠির, ক'জন মহিলার সংসর্গে এসেছ তুমি? ক'জন মহিলা তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? তুমি কি দ্রৌপদীর নিরিখে একথা বলেছিলে? দ্রৌপদী কি সেরকম? আর উত্তরে পিতামহ ভীষ্ম কী বলেছিলেন, তা তো তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে?'

দ্রৌপদীর দিকে ম্রিয়মাণ চোখে একবার তাকাল যুধিষ্ঠির। তারপর অসহায় গলায় মাকে বলল, 'থাক না মা সেসব কথা।'

চড়া গলায় কুন্তী বললেন, 'থাকবে কেন? আজকে তো চুপ করে থাকার দিন নয়! আজকে তোমাদের প্রাপ্তির দিন, আমার বলার দিন, আর হাহাকারের দিন।'

একটু থেমে আবার বললেন কুন্তী, 'নারী সংসর্গরহিত ভীষ্মদেব সেদিন অতি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন নারীজাতি সম্পর্কে। মনে পড়ে তোমার?' তারপর ঊর্ধ্বাকাশের দিকে তাকালেন কুন্তী। চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। হয়তো পিতামহ ভীষ্মের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন অথবা যুধিষ্ঠিরকে কী বলবেন, তা মনে মনে গুছিয়ে নিলেন।

যুধিষ্ঠিরের চোখে চোখ রেখে বললেন কুন্তী, তাঁর কণ্ঠে গভীর শ্লেষের আভাস, 'মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্ম বলেছিলেন—নারীচরিত্রের তুলনা চলে শুধু প্রজ্বলিত অগ্নির সঙ্গে, ময়দানবের মায়ার সঙ্গে, ক্ষুরধার সর্পের সঙ্গে। প্রজাপতি স্ত্রীজাতিকে যখন সৃষ্টি করেছেন, সেই থেকে তারা ব্যভিচারী। সুখৈশ্বর্য দিয়েও তাদের সংযত করা যায় না। কূটবাক্য প্রয়োগ, প্রহার, বন্ধন অথবা নানারকম ক্লেশ দিয়েও নারীদের পরকীয়া থেকে বিরত করা যায় না। এই তো বলেছিলেন, পিতামহ ভীষ্ম! তা-ই না যুধিষ্ঠির?'

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন কুন্তী। বললেন, 'এই তো তুমি, এই-ই তো তোমরা! এই যুধিষ্ঠিরই তো বউকে বাজি ধরতে পারে জুয়াখেলায়! বউকে পণ্যই তো ভাব তুমি! সেই তুমি দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মূল কারণ বলছ! কতটুকু মূল্য দাও তুমি নারীদের? যাদের মূল্য দাও না মোটেই, তাদের দোহাই দিয়ে বিধ্বংসী যুদ্ধের আয়োজন করলে।' অনেকক্ষণ কথা বলে হাঁপিয়ে উঠলেন কুন্তী।

কৃষ্ণ বিব্রত বোধ করতে থাকলেন। কুন্তীকে শান্ত করার জন্য দ্রুত বললেন, 'এই যুদ্ধ অনিবার্য ছিল রাজমাতা।'

'অনিবার্য! অনিবার্য ছিল এই যুদ্ধ!' তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন কুন্তী। তারপর কৃষ্ণকে উদ্দেশ করে হিংস্র গলায় বললেন, 'তোমার মতো কূটচারী কৃষ্ণ যাদের সঙ্গী, তাদের কাছে তো এই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবেই।'

'আপনি আমাকে শুধু শুধু দোষারোপ করছেন রাজমাতা। আমি তো আপনার পুত্রদের ন্যায় আর নীতির পথে চলবার পরামর্শ দিয়েছিমাত্র।' কৃষ্ণ বললেন।

কুন্তী শক্ত গলায় বললেন, 'যে নিজে ন্যায়ের পথে চলে না, সে কী করে সুনীতির পথে চলবার পরামর্শ দেয়? গোটাটা জীবন তো অন্যায়ই করে গেছ তুমি কৃষ্ণ।'

বিভ্রান্ত চোখে কৃষ্ণ কুন্তীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। অন্যদিন হলে রূঢ় কণ্ঠে কুন্তীর প্রশ্নের জবাব ফিরিয়ে দিতেন। কিন্তু আজ যে মহান দিন, আজ বিজয়ের দিন! এক মহারক্তসমুদ্র সাঁতরে আজ পাণ্ডবরা বিজয়ের কূলে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ এই স্বস্তির দিনে কঠোর কথায় কুন্তীকে আঘাত দিতে চান না তিনি। কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না, কেন হঠাৎ রাজমাতা উগ্ররূপ ধারণ করলেন! যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তো তাঁকে জানানো হয়েছে, সেই সময়ে তো প্রীতিভাবই দেখা গেছে তাঁর চোখেমুখে! কিন্তু সেদিনের রাজমাতার সঙ্গে তো আজকের রাজমাতার মিল নেই! যুদ্ধের ভয়ংকরতার জন্য, যুদ্ধের শেষের দিকের সংবাদ অবশ্য তাঁকে দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দ্রোণের নির্দেশে দিন ও রাত্রিব্যাপী যুদ্ধ চলেছে সেসময়। শেষের দিকে এমন কী ঘটনা ঘটল, যার জন্য রাজমাতার মনোবৃত্তিই বদলে গেল! যুদ্ধজয় তো তাঁকে ভীষণভাবে আনন্দিত করার কথা। কিন্তু...।

ভাবনা শেষ করতে পারলেন না কৃষ্ণ। কুন্তীর কথা কানে এলো, 'তুমি বলছ, আমার সন্তানদের তুমি সৎপথে পরিচালিত করেছ, তাই কি কৃষ্ণ? অর্জুনকে দিয়ে তুমি খাণ্ডবদাহন করালে, হাজার হাজার পশুপাখি হত্যা করালে তুমি অর্জুনকে দিয়ে, এটা কি যথার্থ করেছ তুমি? এত বড় রাজা জরাসন্ধ, তিন অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধীশ্বর, তাকে ব্রহ্মচর্য পালন অবস্থায় হত্যা করালে ভীমার্জুনকে দিয়ে। উপবাসে ক্লিষ্ট, অসহায় জরাসন্ধ কী নিদারুণভাবেই না নিহত হলো! এটা কি? তোমার সৎপথে পরিচালনার উদাহরণ?'

কৃষ্ণ নিম্ন স্বরে বললেন, 'জরাসন্ধ দুরাত্মা ছিল, হত্যাই তার প্রাপ্য।'

'ছলনায় হত্যা করিয়েছ তাকে। বীরের মতো যুদ্ধ করার সুযোগ দাওনি জরাসন্ধকে।' কুন্তী বললেন।

'ও বড় শক্তিশালী ছিল, ওভাবে তাকে হত্যা না করলে...।'

কৃষ্ণের কথা শেষ করতে দিলেন না কুন্তী। বললেন, 'ছলনায় হত্যা না করালে জরাসন্ধ অপরাজেয় থাকত, এই তো? আমার দুই পুত্রকে দিয়ে এই মহাবীরকে কূটচালে হত্যা করিয়ে ভীমার্জুনকেই কলঙ্কিত করেছ তুমি। মূলত

জরাসন্ধ আর শিশুপাল তোমার প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছিল। তোমার মতো কৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব ছিল না তাদের প্রতিরোধ করা। তাই আমার পুত্রদের দিয়ে জরাসন্ধকে নিধন করিয়েছ আর শিশুপালকে হত্যা করেছ তুমি নিজে। দুটো হত্যাই অন্যায় পথে হয়েছে।'

'ওই সময় যদি ওদেরকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে না দিতাম, তাহলে মাত্র আঠারো দিনে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধজয় সম্ভব হতো না। ভীম-অর্জুন-যুধিষ্ঠিরের পক্ষে ওদের সামনে দাঁড়ানো কঠিন হতো।' বললেন কৃষ্ণ।

'কাপুরুষের মতো ওদের সরিয়েছ এই পৃথিবী থেকে। বিচক্ষণ কৃষ্ণের নামের সঙ্গে সঙ্গে কাপুরুষ কৃষ্ণের নামও স্মরণ করবে ভবিষ্যতের পৃথিবী।'

'আপনি আমায় অভিশাপ দিচ্ছেন রাজমাতা?'

'অভিশপ্ত হবারই যোগ্য তুমি।' বলে কুন্তী মৌন হলেন।

অর্জুনের ভেতরটা কেঁপে উঠল। কৃষ্ণ পাণ্ডবকুলের সুহৃদ। তিনি বিচক্ষণ। বিপুল পরাক্রান্ত সৈন্যবাহিনীর চেয়ে একজন বিচক্ষণ পরামর্শক যে আরও দুর্দান্ত, আরও বেশি পরাক্রমশালী, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণ তা প্রমাণ করেছেন। কৃষ্ণ না হলে মাত্র সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে এগারো অক্ষৌহিণী সৈন্যকে পরাজিত করা সম্ভব ছিল না কিছুতেই। কত বড় বড় মহারথী ছিলেন দুর্যোধনদের পক্ষে! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, একলব্য—এঁরা। কৃষ্ণেরই কূটচালে বড় বড় যোদ্ধাদের মাথা মাটিতে নামাতে পেরেছে সে। এই কৃষ্ণই তো তাকে দু'দুবার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। একবার সুদর্শনচক্র ধারণ করে। আরবার রথচক্রকে মাটিতে দাবিয়ে দিয়ে। নইলে দ্রোণের আর কর্ণের মারণাস্ত্র তার বক্ষকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিত। আজ সেই কৃষ্ণকে দোষারোপ করছে মা! অভিশাপ দিতে চাইছে! যে কোনো মূল্যে মাকে থামাতে হবে।

অর্জুন মাকে উদ্দেশ করে বলল, 'মা, তুমি সংযত হও। মিত্র কৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়ো না। কৃষ্ণ না হলে এই কুরুক্ষেত্র আমাদেরই রক্তে প্লাবিত হতো। পঞ্চপাণ্ডবের রক্তে ভিজে যেত এই ময়দানের মাটি।'

'চুপ থাকো তুমি অর্জুন, চুপ থাকো! আমার ভেতরটাকে আর ওলটপালট করে দিয়ো না।' বলতে বলতে আবার ডুকরে উঠলেন কুন্তী। অনেকক্ষণ কাঁদলেন তিনি। তারপর নিজেকে সংযত কবার চেষ্টা করলেন।

মৃদু কণ্ঠে বলতে থাকলেন, 'তুমি কৃষ্ণের দোসর অর্জুন। কৃষ্ণের মতো দুরাচারী তুমিও। কৃষ্ণের মতো বহুগামী তুমি। কৃষ্ণের কয়টি বউ জানো? আর তোমার কয়টি? এক দ্রৌপদীতে তুমি তৃপ্ত থাকোনি। যেখানেই গেছ, নারীর প্রতি লুব্ধ হয়ে উঠেছ তুমি। সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, উত্তরা। আর কতজনের নাম বলব?'

তারপর হঠাৎ নিজেকে সংযত করলেন কুন্তী। আবেগের বশে ছেলেকে যা বলার নয়, তা বলে ফেলেছেন। আসলে যা তিনি অর্জুনকে বলতে চেয়েছেন, তা বলা হয়নি। তা-ই বলতে হবে তাকে।

কুন্তী এবার করুণ কণ্ঠে হাহাকার করে উঠলেন, 'তুমি কর্ণকে হত্যা করেছ অর্জুন!'

অর্জুন চমকে মায়ের দিকে তাকাল। বলল, 'ও তো আমার প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল! আচার্য দ্রোণ তাকে তেমন করে অস্ত্রবিদ্যা দান না করলেও পরশুরামের কল্যাণে কর্ণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধনুর্ধরে পরিণত হয়েছিল। দুর্যোধনের মিত্র ছিল সে। পাণ্ডবদের মৃত্যুই ছিল তার একমাত্র কাম্য।'

'মিথ্যে, মিথ্যে অর্জুন। পাণ্ডবদের মৃত্যু তার কাম্য ছিল না। তা যদি হতো যুদ্ধের প্রথম দিকেই তোমাদের সকলের মৃত্যু হতো তার হাতে।'

মায়ের কথা শুনে পঞ্চপাণ্ডব চমকে উঠল ভীষণ। মা একী বলছে!

কুন্তী আবার বলতে শুরু করলেন, 'সেই মহাবীর কর্ণকে তুমি অর্জুন, ওই দুরাচারী কৃষ্ণের প্ররোচনায় অসহায় অবস্থায় হত্যা করলে! তুমি তো নাকি ভুবনখ্যাত বীর, বীর হয়ে তুমি কী নিষ্ঠুরভাবেই না হত্যা করলে কর্ণকে!'

'কর্ণ আমাদের শত্রু ছিল মা। মহাবীর ছিল সে। ওভাবে নিধন না করলে, তাকে হত্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। তাই...।'

'তাই কাপুরুষের মতো নিধন করলে তাকে। কাদাময় নরম মাটিতে রথচক্র দেবে গিয়েছিল তার। কুচক্রী সারথি শল্য ইচ্ছে করে নরম মাটির পথে রথ চালিয়েছিল। শল্য কর্ণের সারথি হলে কী হবে, প্রকৃতপক্ষে ও তো ছিল যুধিষ্ঠিরের পোষ্য। সে একজন মস্তবড় বিশ্বাসঘাতক।'

তার পর নিবিড় একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন কুন্তী। বললেন, 'রথের চাকা মাটি থেকে তুলতে রথ থেকে নেমেছিল কর্ণ। তখন নিরস্ত্র ছিল সে। ওই সময় খড়্গাঘাতে মাথা নামালে তার। ও মা গো...!' বলতে বলতে দুহাতে মুখ ঢাকলেন কুন্তী।

কৃষ্ণ বললেন, 'ওটাই যুদ্ধনীতি। বেকায়দায় শত্রুকে নিধন করা।'

কুন্তী কান্নাজড়িত গলায় বললেন, 'ভেবে দেখো কৃষ্ণ, নিহত হবার আগে অর্জুনকেও একই রকম বেকায়দায় পেয়েছিল কর্ণ। মনে পড়ে কি তোমার, জলকাদার ভূমিতে তোমাদের রথও দেবে গিয়েছিল? তোমার তো মনে না পড়ার কথা নয়! গোটা যুদ্ধে তুমিই তো অর্জুনের রথ চালিয়েছ! তখন তোমাদের সামনে সশস্ত্র কর্ণ রথ থামিয়েছিল। তুমি আর অর্জুন, তোমরা দুজনে তখন মাটি থেকে রথের চাকা তুলতে মগ্ন ছিলে। ওই সময় কর্ণ চাইলে একটি মাত্র অস্ত্রের আঘাতে তোমাদের দুজনকে যমালয়ে

পাঠাতে পারত। পাঠায়নি। কারণ সে মহাবীর, সিংহ সে। আর তোমরা ছিলে শৃগাল। যে-অবস্থায় তোমাদের অস্ত্রাঘাত করেনি কর্ণ, সেই একই অবস্থায় কৃষ্ণের প্ররোচনায় কর্ণকে হত্যা করলে তুমি অর্জুন!' অর্জুনের চোখে চোখ রেখে কথা শেষ করলেন কুন্তী। কুন্তী অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

দ্রৌপদী ধীর পায়ে কুন্তীর দিকে এগিয়ে এলো। বলল, 'মা, আপনি সংযত হোন। কত যোদ্ধা মারা গেছে এই যুদ্ধে! শুধু তো কর্ণ নন, কর্ণের মতো আরও কত রথী মহারথী নিহত হয়েছেন! অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু, আমার পিতা দ্রুপদ, ভাই ধৃষ্টদ্যুম্ন সবাই নিহত হয়েছেন।' বলতে বলতে কণ্ঠ বুজে এলো দ্রৌপদীর।

তারপর নিজেকে সংযত করে দ্রৌপদী আবার বলল, 'আমার প্রিয়তম পাঁচ পুত্র, অশ্বত্থামারা তাদের হত্যা করেছে...!' কথা অসমাপ্ত রেখে কুন্তীর পায়ের কাছে ভেঙে পড়ল দ্রৌপদী।

এবার যুধিষ্ঠির আস্তে আস্তে বলল, 'মা, তুমি এদের জন্য শোক না করে বার বার কর্ণের জন্য শোকাকুল হচ্ছো!'

হাউমাউ করে উঠলেন কুন্তী। দুহাতে বুক চাপড়াতে লাগলেন। হাহাকার করতে করতে বললেন, 'দ্রৌপদী তার পঞ্চপুত্র হারিয়ে যে বেদনাটা পাচ্ছে, আমি কর্ণকে হারিয়ে সেই কষ্টটাই পাচ্ছি।'

পঞ্চপাণ্ডব সমস্বরে প্রায় চিৎকার করে বলল, 'মানে!'

'কর্ণ তোমাদের সহোদর ছিল। আমার কুমারী অবস্থার সন্তান ছিল সে। সে অধিরথপুত্র ছিল না, সে ছিল সূর্যপুত্র।' আকুলিত গলায় কুন্তী বললেন।

কৃষ্ণ, পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী—সবাই অবাক বিস্ময়ে কুন্তীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

এই সময় তাঁদের কানে ভেসে এলো কুন্তীর মর্মন্তুদ আর্তনাদ, 'হা পুত্র, হা কর্ণ! আত্মজ হয়েও মায়ের বাৎসল্য পাওনি তুমি! লোকভয়ে তোমাকে নদীতে বিসর্জন দিয়েছিলাম আমি!'

তারপর পুত্রদের দিকে ফিরে সতেজে বললেন, 'তোমরা যে ওর সহোদর, সেটা কর্ণ জানত, আমিই জানিয়েছিলাম তাকে, একদিন গোপনে তার সঙ্গে দেখা করে। তাই বাগে পেয়েও তোমাদের হত্যা করেনি কর্ণ। তোমরাই তাকে হত্যা করলে, তুমিই নিরস্ত্র কর্ণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলে অর্জুন!' বলতে বলতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন কুন্তী।

একটি হাত, ডান হাত

দ্রোণ বলিলেন, যদি সন্তোষ করিবে।
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটা দিবে।
গুরুর আজ্ঞায় সে বিলম্ব না করিল।
ততক্ষণে কাটিয়া অঙ্গুলি গোটা দিল ॥

দ্রোণ সমীপে অস্ত্রশিক্ষা হেতু একলব্যের
আগমন, 'মহাভারত', কাশীরাম দাস।

আমার নাম একলব্য। পিতার নাম হিরণ্যধনু। মায়ের নাম বিশাখা। পিতামহ অনোমদর্শী। 'মহাভারত' যুগের মানুষ আমি। 'মহাভারতে' আমাকে নিয়ে সামান্য কথা আছে। অন্য চরিত্রগুলো নিয়ে অনেক কথা বলেছেন ব্যাসদেব। তাঁরা রাজরাজড়া, যোদ্ধা, তপস্বী। কাশীরাম দাস যখন 'মহাভারত' বাংলায় অনুবাদ করলেন, আমার চরিত্র-বংশপরিচয় নিয়ে কিছু কথাবার্তা লিখলেন। নব্বইটি পঙ্‌ক্তি লিখলেন আমাকে নিয়ে। ভুল বললাম, নব্বই নয়, অষ্টাশি লাইন। শেষের দুই লাইন তো কবির আত্মঘোষণা আর পুণ্যলাভের প্রলোভন 'মহাভারতের কথা সুধার সাগর। কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর।' ওই অল্প কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে, বিশাল 'মহাভারতে'র তুলনায় অবশ্যই অল্প, কাশীরাম দাস আমার অস্ত্রবিদ্যা-লিপ্সা, দ্রোণাচার্যের প্রত্যাখ্যান এবং মর্মান্তিক ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। এর পর আমি বেঁচেছিলাম কি না, নিজরাজ্যে ফিরে গিয়েছিলাম কি না, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম কি না, নিলে কোন পক্ষে যোগদান করেছিলাম—এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই 'মহাভারতে'।

বাংলাদেশের কোনো এক অর্বাচীন লেখক, নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, দাঁড়ান, একটু মনে করে নিই, হ্যাঁ মনে পড়েছে, হরিশংকর জলদাস, তো উনি নাকি আমাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখেছেন! অনেক পড়াশোনা করেই নাকি তিনি উপন্যাসটা লিখেছেন! তিনি নাকি সেই উপন্যাসে আমার শেষ পরিণতি দেখিয়েছেন। যাকগে, নানাজনে নানাভাবে

তো লিখতেই পারেন আমাকে নিয়ে! আমি আমাকে নিয়ে কী ভেবেছি, তা একটু বলতে পারি।

ব্যাধবংশে জন্ম আমার। ব্যাধদের রাজা ছিলেন হিরণ্যধনু। তাঁরই ঘরে আমার জন্মানো। মা বিশাখা আমাকে জন্ম দেওয়ার পর আর কোনো পুত্রসন্তান গর্ভে ধারণ করেননি।

পাঠশালায় পড়তে পড়তেই আমি অস্ত্রবিদ্যার দিকে ঝুঁকে পড়ি। রাজা এবং রাজন্যপুত্রদের পড়ার জন্য রাজপ্রাসাদেই আলাদা পাঠশালা ছিল। বাবা ওই পাঠশালাতেই আমাকে পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দাদু অনোমদর্শী রাজি হননি। তিনি বাবার চেয়েও অনেক বেশি বাস্তববাদী ছিলেন। পৃথিবীর দিকে সাদা চোখে তাকাতেন। চোখে রঙিন আবরণ ছিল না তাঁর। তিনি বললেন, সাধারণ পাঠশালাতেই পড়বে একলব্য। বাবা দোনামনা করলেন। দাদু বললেন, সাধারণ ব্যাধদের সন্তানরাই পড়ে ওই পাঠশালায়। একলব্য তোমার একমাত্র পুত্রসন্তান। তোমার পরে ও রাজা হবে এই ব্যাধরাজ্যের। যারা তার প্রজা হবে, তাদের না চিনলে রাজ্য চালনা কঠিন হবে একলব্যের জন্য। ওই পাঠশালায় সাধারণ ব্যাধসন্তানদের সঙ্গে মেশার সুযোগ আছে। ধীরে ধীরে তাদের মনমানসিকতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠবে একলব্য। দাদুর যুক্তির কাছে হার মানলেন বাবা। রাজকীয় পাঠশালা পরিহার করে সাধারণ পাঠশালাতে পাঠানো হলো আমাকে।

সেখানে আমি আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে উঠতে লাগলাম। আমার চারপাশে অনেকে জুটে গেল। তারা সবাই সাধারণ নিষাদ সন্তান। তাদের চাওয়া-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠতে লাগলাম আমি।

প্রচলিত ধারার পড়াশোনা আমার তেমন ভালো লাগত না। যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনির প্রতি আমার ঝোঁক তৈরি হতে লাগল। অস্ত্রের কথা উঠলেই আমি উৎসুক হয়ে উঠতাম। আমাদের পাঠশালায় বেশ কয়জন পণ্ডিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে পণ্ডিত টঙ্কারি ছিলেন আলাদা। শিষ্যদের পড়াতে পড়াতে বারবার তিনি যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনিতে চলে যেতেন। নানা অস্ত্রশস্ত্রের বিবরণ দিতেন তিনি। আর্যদের কথা বলতেন তিনি খুব। প্রত্যেক যুদ্ধকাহিনিতে ব্যাধদের প্রতিপক্ষ থাকত আর্যরা। পণ্ডিত টঙ্কারির মুখেই আমার প্রথম আর্যদের কথা শোনা। তিনি বলতেন, আর্যরা অস্ত্রবিদ্যায় অনেক শক্তিশালী। আমাদের যে যুদ্ধবিদ্যা, তা ওদের তুলনায় ঠুনকো। বলতে বলতে তিনি একদিন এ-ও বলেছিলেন, কুরুকুলের এখন শ্রেষ্ঠতম অস্ত্রবিদ এবং গুরু দ্রোণাচার্য। তিনি এই সসাগরা পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধনুর্ধর। তাঁর কাছ থেকে যুদ্ধবিদ্যা গ্রহণ করতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে উঠবে।

ওইদিনই আমার মধ্যে দ্রোণাচার্যের পায়ের কাছে বসে বিদ্যার্জন করার বাসনাবীজ রোপিত হয়ে গেল। আমার মন কীরকম চঞ্চল হয়ে উঠল। প্রচলিত বিদ্যা আমার ভালো লাগছিল না। বাবাকে বলায় বাবা আমাকে এনে ব্যাধ-সেনাপতির হাতে গছিয়ে দিলেন। বাবা বললেন, সেনাপতি মশাই, একলব্যকে যুদ্ধকৌশলে চৌকষ করে তুলুন। পরের বেশ কয়েকটি বছর আমি সেনাপতি জগদম্ভের শিষ্য হয়ে থাকলাম। আমার বয়স বৃদ্ধি পেতে লাগল। আমি একুশে পড়লাম।

ওই সময় আমার প্রতি কেউ অনুরক্ত হয়েছিল কি না জিজ্ঞেস করছেন?

হ্যাঁ, হয়েছিল। সে প্রধান অমাত্য-কন্যা শৈলবালা। আঠারোর দিকেই তার বয়স তখন। আগে আড়েঠাড়ে বললেও সেদিন শৈল সরাসরি তার অনুরাগের কথা বলল। আমার সেইক্ষণে শিহরিত হয়ে ওঠার কথা। বনময়ূরের মতো পেখম মেলে নাচ শুরু করার কথা। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, এদের কোনোটাই আমি করলাম না। উপরন্তু ধীরস্থির চোখে আমি শৈলবালার দিকে তাকিয়ে থাকলাম বেশ কিছুক্ষণ। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললাম, তোমার আশা পূরণের নয় শৈল। আমাকে তুমি ক্ষমা করো। গভীর আকুলতায় শৈল কী যেন বলতে চাইল আমায়। আমি তার কথা না শুনে সে স্থান ত্যাগ করলাম।

কেন এরকম করলাম জিজ্ঞেস করছেন?

এরকম না করে যে আমার কোনো উপায় ছিল না! তখন আমার ধ্যানে আর জ্ঞানে যে মহর্ষি দ্রোণাচার্য! কখন আমি তাঁর কাছে যাব, কখন তাঁর কাছ থেকে ধনুর্বিদ্যা অর্জন করব—এই চিন্তায় তখন বিভোর আমি। তাই তো শৈলবালার প্রেমকে হেলা-অবহেলা দেখালাম।

এর পরের ঘটনা আপনাদের জানা। বাবার কাছে দ্রোণাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার অনুমতি চাইলাম আমি। বাবা কিন্তু রাজি হলেন না। কেন রাজি হলেন না, আমি জানতাম না, কিন্তু বাবা ভালো করেই জানতেন। আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব বহুকালের। ব্রাহ্মণরা যে শূদ্রদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন, সেটা বাবার ভালো করেই জানা ছিল। দ্রোণাচার্য যে আমাকে অস্ত্রশিক্ষা দেবেন না, তাও বাবার অজানা ছিল না। দাদু অনোমদর্শীও তা জানতেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! দ্রোণাচার্যের কাছে আমাকে পাঠাতে দাদু রাজি হয়ে গেলেন। শুধু রাজি হওয়া নয়, বাবাকে প্ররোচিত-প্রণোদিত করলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত আমার প্রস্তাবে সায় দিলেন বাবা।

গিয়েছিলাম আমি হস্তিনাপুরে, দ্রোণাচার্যের পাঠশালায়। রাজপুত্রদের পড়ানোতে নিমগ্ন তখন তিনি। আমি কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। সূর্যের আলোতে আমার দীর্ঘছায়া গুরুদেবের সম্মুখভাগ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল।

গুরুদেব কেন বলছি? শিক্ষা গ্রহণ না করেও?

আচার্য দ্রোণ আমার তো শিক্ষাগুরুই! পণ্ডিত টঙ্কারির কাছে তাঁর নাম শোনার পর থেকেই আমি তাঁকে আমার গুরুদেবের আসনে বসিয়েছি।

আমার গাঢ় ছায়া অনুসরণ করে গুরুদেবের দৃষ্টি আমা পর্যন্ত এলো। তিনি চমকে উঠলেন ভীষণ। এরকম কুচকুচে কালো, ধূলি-ধূসরিত দেহ, অনার্য শরীরগঠন, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, নাতিদীর্ঘ আমাকে তো তিনি আগে কখনো দেখেননি! আর এই অনার্য যুবকটি এরকম সুরক্ষিত এলাকায় ঢুকল কী করে? কী চায় সে? কোনো অশুভ উদ্দেশ্যেই কি সে এখানে এসেছে? এরকম তিনি যখন ভাবছেন, আমি দ্রুত তাঁর সামনে এগিয়ে গেলাম এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলাম। গুরুদেব প্রায় স্তম্ভিত তখন। কী বলবেন, ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

তখনই আমি আমার মনোবাসনা ব্যক্ত করলাম—আমি আপনার শিষ্য হতে চাই।

আমি যে এক অনার্য ব্যাধসন্তান, ভাবে-চেহারায় আর পোশাকে ততক্ষণে বুঝে গিয়েছিলেন গুরুদেব। সামান্য সময় কী যেন ভাবলেন তিনি। ওই সময় সামনে সমবেত ছাত্রদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। অর্জুনের মুখেই যেন অবহেলা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বেশি। ও যে অর্জুন, বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি তেমন। মেধাবী ছাত্রের সর্বলক্ষণ তার চোখেমুখে। তার সম্পর্কে শুনে শুনে তার একটা অবয়ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল আমার মধ্যে।

আমার ব্যাকুল প্রস্তাবের উত্তরে আচার্য কী বলেছিলেন জানতে চাইছেন?

উত্তরটা আপনাদের কবি কাশীরাম দাস তাঁর অনূদিত 'মহাভারতে'র আদিপর্বে লিখে গেছেন।

কী লিখেছেন?

লিখেছেন—

> দ্রোণ বলিলেন তুই হোস নীচ জাতি।
> তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি।

দ্রোণাচার্য ছাত্র হিসেবে আমাকে গ্রহণ করলেন না। অনেকটা দূর দূর করে কুকুর-বেড়ালের মতো তাড়িয়ে দিলেন আমায়। আমি তখন অথই সমুদ্রে! কী করব আমি! রাজধানীতে ফিরে যাব? কোন মুখে ফিরব? বাবাকে যে বলে এসেছি, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ হয়ে ফিরব আমি বাবা, দেখে নিয়ো। দাদু অনোমদর্শী তো বহু আশা নিয়ে অপেক্ষা করে আছেন, আমি একদিন রণ-ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে ফিরব! খালি হাতে আমাকে দেখে

তাঁরা দুজনেই তো আশাহত হবেন ভীষণ! না, না। কিছুতেই বিদ্যার্জন না করে হিরণ্যধনুর রাজধানীতে ফিরব না আমি।

গুরুর সম্মুখভাগ থেকে ফিরে আসার সময় যথাদূরত্ব বজায় রেখে দ্রোণাচার্যকে প্রণাম করেছিলাম। মাটিতে মাথা ঠেকিয়েই প্রণাম করেছিলাম আমি। ওই সময় মনে মনে বলেছিলাম, আজ যাকে নীচ জাতি বলে শিষ্যত্ব প্রদানে প্রত্যাখ্যান করলেন, একদিন আমি খ্যাতিমান ধনুর্ধর হয়ে আপনাকে, গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখিয়ে দেব।

সেই দুপুরে পাঠশালা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। না, আমার মনে কোনোরূপ গ্লানি ছিল না তখন। আমাকে ঘিরে-বেড়ে রাখা সকল ব্যর্থতা-বিষণ্নতা কোথায় যেন উবে গিয়েছিল তখন!

এরপর কী হয়েছিল, 'মহাভারতে'র কল্যাণে সব জেনেছেন আপনারা। জানেন নি যা, তা বলছি।

গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে দ্রোণাচার্যের মৃন্ময় মূর্তি বানিয়েছিলাম আমি। ওই মূর্তির সামনেই আমার অস্ত্রসাধনা শুরু হয়। প্রথম দিকে কিছুই হচ্ছিল না আমার। শুধু ব্যর্থতা আর বিফলতা। কোনোক্রমেই দমিনি আমি। অস্ত্রসাধনা চালিয়ে গেছি। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিলাম। শুধু আচার্য দ্রোণকে দুই ভুরুর মাঝখানে রেখে কঠোর সাধনা চালিয়ে যেতে লাগলাম আমি।

সেই প্রভাতে আশ্চর্যজনক ঘটনাটি ঘটল।

শয্যাত্যাগ করে ধনুটি হাতে নিলাম। অলসভাবে তীরটি ধনুতে যোজনা করে বহুদূরের একটি আম্রফলকে লক্ষ্য করে ছুড়লাম। কী অদ্ভুত! কী বিমোহন ঘটনা! তীরটি আম্রফলে গিয়ে গেঁথে গেল। আমি পরপর আমার চারপাশে বহুদূর ব্যাপী ছড়ানো বস্তু লক্ষ্য করে তীর ছুড়লাম। সবগুলো তীরই লক্ষ্যভেদ করল। আমি বুঝতে পারলাম, আমার সাধনা সফল হয়েছে। আমি আনন্দে ধেই ধেই করে নেচে উঠলাম। ঊর্ধ্বদিকে দুই বাহু বিস্তার করে চিৎকার করে উঠলাম, গুরুদেব, দেখে যান আপনার প্রত্যাখ্যাত শিষ্য আজ সফল হয়েছে! যা কিছুকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়েছি, তাতেই বিদ্ধ হয়েছে!

আমার এই চিৎকারধ্বনি গুরুদেব শুনতে পেয়েছেন কি না, জানি না। একদিন তিনি ভীম, অর্জুনাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আমার কুটিরের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

কেন?

গুরুদক্ষিণার জন্য। আসলে কুরুপুত্ররা মৃগয়ায় এসেছিল। তাদের পালিত কুকুরটি আমার ছোড়া তীর দ্বারা বিদ্ধ হয়েছিল। বিদ্ধ হওয়ার ভঙ্গিটি

ছিল অকল্পনীয়। তাতেই অর্জুন চটে গিয়েছিল। এই ভঙ্গিটি তো তার অজানা! তাহলে তার চেয়েও বড়ো ধনুর্ধর আছে? কুকুরের দেখানো পথ বেয়ে গুরু-শিষ্যরা উপস্থিত হয়েছিলেন আমার আঙিনায়। আঙিনার মাঝখানে নিজমূর্তি দেখে ভীষণ চমকে গিয়েছিলেন দ্রোণাচার্য। এ তো তাঁরই মূর্তি!

জিজ্ঞেস করেছিলেন, কে তুমি?

বলেছিলাম, একলব্য। আপনার প্রত্যাখ্যাত শিষ্য।

গুরুর মনে পড়ে গিয়েছিল আমার কথা। বলেছিলেন, ও—, ছোটজাত বলে যাকে আমি পাঠশালায় ভর্তি করাইনি, সে-ই তুমি?

হ্যাঁ, গুরুদেব।

এ মূর্তি কার?

আপনার।

আমার!

দেখতে পাচ্ছেন না—সেই নাক, সেই গৌরবর্ণ, সেই চোখ! সেই উপবীত?

দেখতে পাচ্ছি।

আমি আপনার মূর্তি গড়ে তাঁর পায়ের কাছে সাধনা করে গেছি। সফল হয়েছি।

কী সফল হয়েছ?

যা ইচ্ছে তাই করতে পারি এখন।

যেমন?

বহুদূরের, সে যত দূরেরই হোক না কেন, লক্ষ্যভেদ করতে পারি।

আর?

যে বস্তুর গায়ে হাত দিই, তা-ই অস্ত্র হয়ে যায়।

মানে?

ওই আপনার পাশের কুকুরটিকে দেখুন। তার মুখ ভেদকরা ঘাসের ডাঁটা। আমিই ছুড়েছি। মুখে যা এসেছে, তাকেই মন্ত্র হিসেবে পড়ে গেছি। আমার ছোড়া ডাঁটা ঘেউ ঘেউ রত কুকুরটির মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। রক্তপাত হয়নি।

গুরুদেবের চোখ দুটো বিস্ফারিত। তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, কোনো মন্ত্র পড়োনি মানে!

হ্যাঁ, তীর ছুড়তে এখন আমার মন্ত্র লাগে না। যা মুখে আসে, তা-ই মন্ত্র হয়ে যায়।

এরপর হঠাৎ গুরুদেবের সারামুখে চাঁদের হাসি ছড়িয়ে পড়ল। কী যেন আওড়ে গেলেন। ঠোঁট নড়ল, শব্দ হলো না।

তিনি বললেন, এসব শিখলে কোথেকে?

আমি বললাম, আপনার কাছ থেকে। প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে। আপনিই আমার গুরু। ওই মূর্তি তার সাক্ষী।

কঠোর-কঠিন একটা রাগের ঝিলিকে গুরুদেবের দুচোখ ঝলসে উঠল। তবে তা পলকের জন্য।

হঠাৎ তিনি বললেন, তাহলে তো তোমাকে গুরুদক্ষিণা দিতে হবে বাবা।

গুরুদক্ষিণা!

হ্যাঁ তো, ওই যে তুমি বললে আমি তোমার গুরু, আমার কাছ থেকে তোমার সবকিছু শেখা!

আমি সামান্য সময়ের জন্য মাথা নত করলাম।

কী ভাবলাম তখন?

আপনারা এখন যা ভাবছেন, তা-ই ভেবেছি তখন আমি। গুরু না হয়েও গুরুদক্ষিণা চান যাঁরা, তাঁরা কী ধরনের মানুষ, এই তো ভাবছেন আপনারা?

আমি বললাম, কী চান গুরুদেব? কী পেলে আপনি আনন্দিত হবেন?

ভাবলেশহীন মুখে দ্রোণাচার্য বললেন, তোমার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি।

আমি চমকে উঠলাম ভীষণ। তবে সেই চমকানো নিজের ভেতরে চেপে রাখলাম। ধীর পায়ে কদলিবৃক্ষের দিকে এগিয়ে গেলাম। একটি পত্রের অগ্রভাগ কেটে আনলাম। গুরুর পায়ের কাছে রাখলাম। ওই পায়ের কাছেই হাঁটু গেড়ে বসলাম। কোমর থেকে টাঙ্গিটি বের করলাম। বিনা দ্বিধায় বৃদ্ধাঙ্গুলিটি কর্তন করলাম। পত্রভাগে রাখলাম।

গুরুদেব আর তিলার্ধ সময় অপেক্ষা করলেন না। সশিষ্য পেছন ফিরলেন।

আমি তাকিয়ে দেখলাম—ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য শূদ্র একলব্যের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে অপসৃয়মান হচ্ছেন।

তীর নিক্ষেপ করার জন্য বা অসি চালনার জন্য ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি যে অপরিহার্য! সেটি কেড়ে নিয়ে শূদ্রবংশের উদীয়মান যোদ্ধাকে ধ্বংস করতে পেরে ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যের সারা অবয়বে তখন অপার তৃপ্তির উপস্থিতি তখন।

আমি কী করলাম তখন, কী ভাবছিলাম?

কদলিপত্রের অগ্রভাগে স্থিত কর্তিত আঙুলটির দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। আঙুলটি তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আঙুলটির চারপাশে থকথকে রক্ত তখন। আর আমার ডান হাত থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরে ঝরে মাটি ভিজে উঠছিল। আমি আমার হাতের দিকে তাকাইনি, তাকিয়ে থেকেছিলাম ওই আঙুলটির দিকে। ওই আঙুল যে আমার সর্বস্ব! আমার সকল কীর্তির কারিগর! ওই বুড়ো আঙুলটির কল্যাণেই তো আমার সকল অর্জন! ওটি না থাকলে তো আমি ধনুতে টঙ্কার দিতে পারব না! ওটা না থাকা মানে এই পৃথিবী থেকে একলব্য নামের যোদ্ধাটির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়া।

না না, তখন আমার মধ্যে বিষাদ বা বিপন্নতা কাজ করছিল না। আমার মধ্যে তখন ঘৃণা আর ভক্তির দ্বন্দ্ব চলছিল। গুরু দ্রোণাচার্যের প্রতি যে আমার অচলাভক্তি! সেই শ্রদ্ধার মানুষটি কেন আমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি কেটে নিলেন! তিনি তো মহান মানুষ! তিনি কেন মদ এবং মাৎসর্যে প্ররোচিত হলেন?

আবহমান কাল ধরে উঁচু গোত্রের মানুষেরা শূদ্রদের নরাধম ভেবে এসেছে, তার দ্বারাই তো তিনি প্রণোদিত হয়েছেন আমার আঙুলটি কেটে নেওয়ার জন্য।

হঠাৎ আমি চিৎকার করে উঠলাম, হে গুরুদেব, বলে যান—আজ থেকে আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করব, না ঘৃণা করব?

আমার এই আর্তচিৎকার সমস্ত বনভূমির বৃক্ষে বৃক্ষে প্রতিধ্বনি তুলল। জানি না, আমার জিজ্ঞাসা দ্রোণাচার্যের কান পর্যন্ত পৌঁছেছিল কি না!

তিতাসপাড়ের উপাখ্যান

এক

'আমি একবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যেতে চাই।'

চিত্রগুপ্ত অতিশয় পুরানো বালামের একটি পৃষ্ঠায় গভীর মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখছিলেন। পৃষ্ঠাটি নানা সংখ্যায় ভর্তি। মঘি, শকাব্দ, খ্রিস্টাব্দ, বঙ্গাব্দ—এসবের হিসেবপত্তর আছে তাতে। চিত্রগুপ্তকে দেখে মনে হচ্ছে, কোনো একটা সন-তারিখের গরমিলে তিনি উদ্বিগ্ন। এ কারণেই বোধহয় বক্তার আর্জি চিত্রগুপ্তের কানে ঢোকেনি।

বক্তা সেটা বুঝতে পারলেন। তাই গলা একটু উঁচু করে আবার বললেন, 'প্রণাম গুপ্তমশাই। আমি একবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যেতে চাই।'

যমালয়ে বয়স-নির্বিশেষে সবাই চিত্রগুপ্তকে গুপ্তমশাই বলে সম্বোধন করেন। তবে সবাই যে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে সম্বোধন করেন, এমন নয়। অতি বয়সী এবং সামাজিক আর রাজনৈতিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যাঁরা, তাঁরা তাঁকে চিত্রগুপ্তই ডাকেন। নামের শেষে মশাইটশাই বলেন না। কিন্তু বর্তমানের আর্জিকারী বয়সে নবীন। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়স তাঁর। তুলনামূলকভাবে কণ্ঠও নবীন।

প্রণাম, মশাই—এসবে মুগ্ধ হয়েই বোধহয় চিত্রগুপ্ত বক্তার দিকে মুখ তুললেন। পাকা মোটা ভ্রুর নিচ দিয়ে পুরু লেন্সের চশমার ওপর দিয়ে বক্তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আরে অদ্বৈত, কেমন আছো তুমি?'

'আজ্ঞে ভালো আছি। স্বর্গে এমন কিছুর কি অভাব আছে যে, খারাপ থাকা যায়! সুখ আর ঐশ্বর্যের মধ্যেও যে বেদনা আছে, তা আমার স্বর্গজীবনে আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।' বিনীত কণ্ঠে বললেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

চিত্রগুপ্ত বললেন, 'তোমাদের নিয়ে বাপু আর পারা গেল না! মর্ত্যে তোমরা আহাজারি করো এটা নেই সেটা নেই বলে; আবার স্বর্গে এসেও অতৃপ্তিতে ভোগো, তোমাদের চারপাশে সবকিছু আছে বলে।'

ডান হাত দিয়ে চশমাটা খুললেন চিত্রগুপ্ত। বাম হাতের তালু দিয়ে কপালটা একবার মুছলেন। চিরবসন্তের স্বর্গে চিত্রগুপ্তের কপাল যে ঘেমে

গেছে, এমন নয়। তবে তার মনটা তৃপ্তিতে ভরে উঠলে তিনি অকারণে বাম হাতের তালু দিয়ে কপাল মোছেন। এটাকে তাঁর অভ্যেসও বলা যায়, আবার মুদ্রাদোষও বলা যায়।

একটা তৃপ্তির শ্বাস ত্যাগ করে চিত্রগুপ্ত অদ্বৈতকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তা তুমি কী যেন একটা বলছিলে?'

'আমি একবার আমার জন্মভূমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যেতে চাই।' কণ্ঠকে যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললেন অদ্বৈত।

'ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়!' কপাল কুঁচকে বললেন চিত্রগুপ্ত।

অদ্বৈত বললেন, 'ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গোকর্ণঘাটে আমার জন্ম। জন্মভিটে ছেড়েছি পঁচাশি বছর হয়ে গেল। জন্মস্থানটা একবার দেখার জন্য প্রাণটা বড় আকুলিবিকুলি করছে! তিতাসপাড়, মালোপাড়া আনন্দবাজার-জগৎবাজার, কালভৈরবীর মন্দির, চেপা শুঁটকি...।' বলতে বলতে থেমে গেলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। প্রবল একটা আবেগ অদ্বৈতের চোখেমুখে ঝকমক করতে লাগল।

অদ্বৈতের আবেগি কণ্ঠ চিত্রগুপ্তকে ছুঁয়ে গেল বেশ। কিন্তু নিজেকে সংযত রাখলেন তিনি। বললেন, 'যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যেতে চাইছো তুমি, সেখানে তো ভীষণ অস্থির অবস্থা এখন!'

'অস্থির অবস্থা!' শঙ্কিত গলায় বললেন অদ্বৈত।

চিত্রগুপ্ত বললেন, 'হ্যাঁ, সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। কেন, তুমি জানো না?' প্রশ্নটি করেই একটু থমকে গেলেন চিত্রগুপ্ত।

তারপর শান্ত গলায় বললেন, 'ও হো, ব্যাপারটা তো তোমার জানার কথা নয়! তুমি তো পৃথিবী ছেড়ে এসেছো অনেকটা বছর হয়ে গেল! স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল—ত্রিজগতের অনুপুঙ্খ খবর আমাকে রাখতে হয় বলে আমি জানি।'

অদ্বৈত উদ্বিগ্ন চোখে বললেন, 'আমি আপনার কথা ভালো করে বুঝে উঠতে পারছি না। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তো কোনো সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। ছোটখাটো দু'একটা বর্ণগত দ্বন্দ্ব ছিল বটে, তবে সাম্প্রদায়িকতা বলতে যা বোঝাতে চাইছেন, সেরকম তো কিছু ছিল না ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়!'

'তুমি কি হলফ করে বলছো, এরকম কিছু ছিল না?' চোখ দুটো চিকন করে চিত্রগুপ্ত বললেন।

এবার একটু থতমত খেলেন অদ্বৈত। আমতা আমতা করে বললেন, 'সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্বটা যে একেবারেই ছিল না, তা নয়। যেমন ধরেন

উঁচুজাতের লোকেরা আমাদের একটু ঘৃণাটিনা করতেন, আমাদের পাড়াকে গাবরপাড়া বলতেন, এক হুঁকাতে আমাদের তামাক খেতে দিতেন না, এই যা। কিন্তু আপনার উদ্বিগ্নতা দেখে আমার মনে হচ্ছে, এর চেয়ে বড় কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে আমার ব্রাহ্মণবাড়িয়া।'

চিত্রগুপ্ত ডান কাঁধের উত্তরীয় বাম কাঁধে ফেলে বললেন, 'তুমি যথার্থ ধরতে পেরেছো অদ্বৈত। সেদিন ভোরসকালে একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম, তো স্বর্গউদ্যানেই রবিশংকরের সঙ্গে দেখা। রবিশংকরকে চেনো তো? আরে বাবা, তোমাদের শিবপুরের উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর শিষ্য। গুরুর মুখে সেও নাকি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুরবস্থার কাহিনি শুনতে পেয়েছে। খাঁ সাহেব নাকি বলেছেন—তাঁর নামে দেওয়া আলাউদ্দিন সঙ্গীত ভবনটি তছনছ করে দিয়েছে উগ্র জঙ্গীগোষ্ঠীরা। তাঁর স্মৃতিমাখা সকল কিছুতে আগুন দিয়ে ছাই করে ফেলতে দ্বিধা করেনি ওরা।'

'আর আমার গোকর্ণঘাট! মালোপাড়া! আমার জন্মপাড়ার কী অবস্থা গুপ্তমশাই?' আকুল গলায় জিজ্ঞেস করেন অদ্বৈত।

চিত্রগুপ্ত আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললেন, 'গোকর্ণঘাটের কিছু হয়নি, তবে নাসিরনগর রেহাই পায়নি।'

'কোন নাসিরনগর?'

'নাসিরনগর তুমি চিনবে না। তোমার সময়ে অন্য নাম ছিল, সাতচল্লিশের দেশভাগের পর নতুন নামকরণ হয়েছে স্থানটির।' একটু থামলেন চিত্রগুপ্ত। চাপা একটা শ্বাস ত্যাগ করলেন।

তারপর আবার বললেন, 'ওই নাসিরনগরে তোমার সম্প্রদায়ের একটা পাড়া আছে। বর্বররা সেই পাড়াটি কুপিয়ে-জ্বালিয়ে ছারখার করে ছেড়েছে।'

অদ্বৈত মল্লবর্মণ হঠাৎ আর্তচিৎকার দিয়ে উঠলেন। দুই হাতের তালু দিয়ে দুই কান চেপে ধরে বললেন, 'আর শুনতে চাই না গুপ্তমশাই! কৈবর্তদের দুর্দশার কথা আর শুনতে চাই না, শুনতে চাই না!' বলতে বলতে কাঁদতে শুরু করলেন তিনি।

চিত্রগুপ্ত বাধা দিলেন না। মনে করলেন, কাঁদুক ছেলেটা। কেঁদেকেটে একটু হালকা হোক। যা আয় করতো তার থেকে সামান্য অংশ রেখে বাকিটুকু দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মালোদের সাহায্য করে যেত যে, সে তো নিজ গোষ্ঠীর মানুষের লাঞ্ছনার সংবাদ শুনে কাঁদবেই।

বেশ কিছুক্ষণ পর কান্না থামিয়ে অদ্বৈত বললেন, 'আমাকে যেতে দিন গুপ্তমশাই। আমি আমার জন্মভূমিটা, আমার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খেটে-খাওয়া মানুষগুলোর দুরবস্থা নিজ চোখে দেখতে চাই।'

চিত্রগুপ্ত স্থির চোখে অদ্বৈতের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, 'যেতে চাইছো যখন, যাও। আমি যমরাজকে বলে সাতদিনের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নেবো। ছুটি মঞ্জুর করাতে একটু কাঠখড় পোড়াতে হবে আমায়। ইদানীং পৃথিবীর কথা শুনলেই মহারাজ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বলেন, নষ্ট হয়ে গেছে পৃথিবীটা, একেবারে নরক হয়ে যাচ্ছে!'

চিত্রগুপ্তের কথা শুনে যাওয়া ছাড়া অদ্বৈতের আর কোনো উপায় নেই। তিনি শুধু ভাবতে থাকেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তিতাস নদী, কিশোর, সুবল— এসবের কথা, এদের কথা।

এবার চিত্রগুপ্ত একটু আয়েশি ভঙ্গিতে বললেন, 'যাও, কালকেই যাও তুমি। আগামীকাল তোমার জন্য বিশেষ একটা দিনও বটে।' বলে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

অদ্বৈত বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'বিশেষ দিন! বুঝলাম না গুপ্তমশাই! আর আপনি মৃদু মৃদু হাসছেনই-বা কেন?'

'শোনো ছোকরা, স্বর্গে এসে দিন-তারিখ সব ভুলে বসে আছো। আজ ডিসেম্বর মাসের শেষদিন। আগামীকাল নতুন বছরের প্রথম দিন।'

'শেষদিন বা প্রথম দিন—বিশেষ দিন হতে যাবে কেন?'

চিত্রগুপ্ত বললেন, 'মাথাটা দেখি একেবারে গেছে তোমার! পহেলা জানুয়ারি কি তোমার জন্মতারিখ নয়?'

'হ্যাঁ, তাই তো! ১৯১৪ সালের পহেলা জানুয়ারিতেই তো আমি জন্মেছিলাম!'

'তাহলে! কী একটা বই লিখে তুমি নাকি হই চই ফেলে দিয়েছিলে? একটু ভুল বললাম। তুমি তো সেই হই চই দেখে আসতে পারোনি! তোমার মৃত্যুর পরেই তো বইটি প্রকাশিত হয়েছিল! বইটি নাকি বাঙালিরা লুফে নিয়েছে। খ্যাতিমান সাহিত্যিক হিসেবে তোমাকে নাকি সবাই মান্যিগণ্যি শুরু করেছে। যাও, যাও, নিজে গিয়ে দেখে এসো সেই মান্যিগণ্যির ব্যাপার-স্যাপারগুলো। আর তোমার পাড়ার লোকরাই-বা তোমাকে নিয়ে বর্তমানে কী ভাবছে, জেনে এসো?'

তৃপ্তিতে অদ্বৈত মল্লবর্মণের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চিত্রগুপ্তকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি আপনাকে প্রণাম করবো গুপ্তমশাই।'

'প্রণাম করবে! আচ্ছা করো।' বলে পা দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিলেন চিত্রগুপ্ত।

'তবে হ্যাঁ ছোকরা, মর্ত্যের কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না, তোমার কণ্ঠস্বরও শুনতে পাবে না কেউ। এটাই স্বর্গের বিধান।' প্রণাম গ্রহণ করতে করতে চিত্রগুপ্ত বলে গেলেন।

দুই

গোকর্ণঘাট দেখার আগে শহরটা একবার ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করল অদ্বৈতের। টাউন হলের পাশ দিয়ে এগোচ্ছেন তিনি। পায়ে তাড়া তাঁর। সকালে আসতে আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। আগের দিন যমরাজের কাছ থেকে ছুটিটা মঞ্জুর করানো যায়নি বলে চিত্রগুপ্ত ছাড়ছিলেন না তাঁকে। যমরাজ আবার আজকে সকালে শয্যাত্যাগ করতে বিলম্ব করলেন। গত রাতে ইন্দ্রসভায় গীত-নৃত্যের আয়োজন করা হয়েছিল। সোমরসের বিপুল আয়োজন ছিল। স্বর্গ-নর্তকী উর্বশী নেচেছিলও গভীর রাত পর্যন্ত। অন্যান্য দেবতা কোন ছার, খোদ যমরাজের মতো নিষ্ঠুর, নির্মোহ, বৃদ্ধ দেবতাও মজে গিয়েছিলেন আপাদমস্তক। তাই ঘুম থেকে দেরি করে ওঠা যমরাজের। মনটা তাঁর ফুর্তিতে ভরে ছিল বলে অদ্বৈতের সাতদিনের ছুটি মঞ্জুর করতে দোনামনা করেননি যমরাজ।

টাউন হল ছাড়িয়ে একটু এগোতেই মাইকের আওয়াজ শুনতে পেলেন অদ্বৈত। আওয়াজের প্রতি কান দুটো তুললেন তিনি। মাইকে ভরাট কণ্ঠে কে যেন বলছে, 'গতকাল থেকে আমাদের তিনদিনব্যাপী অদ্বৈতমেলার শুরু হয়েছে। উদ্বোধন করেছেন মাননীয় এমপি মহোদয়। তিনি বলেছেন, ঘরে ঘরে অদ্বৈতকে পৌঁছে দিতে হবে। অদ্বৈতের পাড়ার লোকদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে।' বক্তা একটু থামল।

মানে! এই পঁচাশি বছর পরও আমার পাড়ার মালোরা শিক্ষিত হয়ে ওঠেনি তাহলে! ভাবলেন অদ্বৈত।

মাইকে আবার বলা হচ্ছে, 'আজ পহেলা জানুয়ারি। আজ আমাদের জন্য এক পবিত্র দিন, আজ অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্মদিন। এই দিনে আমরা অদ্বৈতকে নিবিড়ভাবে স্মরণ করবো, শ্রদ্ধা জানাবো। আজ বিকেলে একজন সাহিত্যিককে অদ্বৈত-সম্মাননা জানানো হবে। অদ্বৈতের মতো মালো সম্প্রদায়েই জন্ম তাঁর।' বক্তা দম নেওয়ার জন্য আরেকটু থামল।

অদ্বৈত ভাবলেন—অদ্বৈত-সম্মাননা! অদ্বৈত-সম্মাননা আবার কী! আমার সম্প্রদায়ের লেখক কে! তাহলে জেলেরা একেবারে অশিক্ষিত থেকে যায়নি! কেউ কেউ লিখছে তাহলে!

বক্তা আবার শুরু করল, 'এই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অমূল্য সন্তান আমাদের অদ্বৈত মল্লবর্মণ। এই মহান সাহিত্যিকের নামে গত তিন বছর ধরে আমাদের বিবেচনায় সেরা সাহিত্যিককে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। এই অদ্বৈত সম্মাননার মাধ্যমে আমরা প্রতি বছর যেমন অদ্বৈতকে স্মরণ করছি, তেমনি

তাঁকে নিয়ে যাঁরা লেখালেখি করছেন, তাঁদেরকেও মাননীয় করে তুলছি।' একটু দম নিল ঘোষণাকারী।

তারপর আবার বলতে লাগল, 'আর এখন আমরা, মানে আমাদের সংগঠনের সবাই মিলে গোকর্ণঘাটের মালোপাড়ায় যাবো। অদ্বৈতের মূর্তির পাদদেশে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করবো। আনন্দের সংবাদ এটা যে, আমাদের সঙ্গে শামিল হয়েছেন এবছর অদ্বৈত-সম্মাননাপ্রাপ্ত লেখক শিবদয়াল জলদাস। যাঁরা বাইরে অহেতুক ঘোরাঘুরি করছেন, তাঁদেরকে অতিসত্বর ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত চত্বরের মঞ্চের কাছাকাছি চলে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।'

অদ্বৈত মল্লবর্মণ দ্রুত পা চালালেন। মঞ্চের নিকটে গিয়ে দেখলেন, গোটাদশেক মানুষ জড়ো হয়েছে। নেতা গোছের একজন নানা নির্দেশনা দিচ্ছেন। অন্যরা তাঁর নির্দেশনা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। একটু তফাতে দুজন দাঁড়িয়ে। একজনের গায়ে শার্ট-প্যান্ট, অন্যজন পরেছেন পাজামা-পাঞ্জাবি। শার্ট-প্যান্ট পরা ভদ্রলোকের নাম আইউব সৈয়দ। ছড়া-কবিতা লেখেন। কবিতা লিখলে কী হবে, তাঁর চোখ-মুখ-চুল-পরিধেয় কিন্তু কবিদের মতো নয়। প্রাবন্ধিকের মতো। ছোট করে ছাঁটা চুল, পারিপাট্যের ছাপ তাঁর চলনে-বলনে।

পাঞ্জাবিপরা লোকটি দেখতে বাবু বাবু। যেকোনো অপরিচিত মানুষ দেখে বলবে, ভদ্রলোক কবিতা লেখেন। লম্বা চুল, পরিপাটি করে বাম দিকে সিঁথি কাটা। দেহটা দীর্ঘ তাঁর। গৌরবর্ণ। এই লোকটি কিন্তু কবিতা লেখেন না, লেখেন গল্প-উপন্যাস। তিনি শিবদয়াল জলদাস। এবারের অদ্বৈত-সম্মাননাপ্রাপ্ত লিখিয়ে।

এই দুজনের কাউকে অদ্বৈত চেনেন না, শুধু এই দুজন কেন, মঞ্চের পাশে সমবেত কাউকেই চেনার কথা নয় অদ্বৈতের। তিনি হালকা চোখে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। দেখলেন—ধীরেন্দ্রনাথ চত্বরটি আয়তক্ষেত্রিক। পূর্বদিকে উঁচু পাঁচিল, দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকে ছোট ছোট কক্ষ। এগুলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাহিত্য-সংস্কৃতিলগ্ন নানা সংগঠনের জন্য বরাদ্দকৃত। উত্তর দিকে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নামে সিমেন্টের উঁচু স্থায়ী মঞ্চ।

দেখতে দেখতে অদ্বৈত একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলেন। একজনের কথায় সংবিতে ফিরলেন, 'শিবদয়াল স্যার, আমরা এখনই রওনা দেবো।'

'আমরা তৈরি মনির ভাই।' বললেন উদ্দিষ্ট শিবদয়াল জলদাস।

মনির হোসেন সামনে এসে বললেন, 'বলছিলাম কী স্যার, মালোপাড়াটা খুব বেশি নিকটে নয়! আপনি যাবেন? কষ্ট হবে কিন্তু!'

অদ্বৈত বুঝলেন—এই-ই শিবদয়াল জলদাস। এই জলদাসবাবুই তাহলে এবারের অদ্বৈত-সম্মাননা পাচ্ছে! এই শিবদয়ালই তাহলে জলপুত্র! সব তো বোঝা গেল! কিন্তু ওই মনির, যার বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই, কেন শিবদয়ালকে স্যার সম্বোধন করছেন? জলদাস কি মনির সাহেবের শিক্ষক?

এই সময় শিবদয়ালের কণ্ঠ অদ্বৈতের কানে এলো, 'কী যে বলেন না মনির সাহেব! অদ্বৈতের জন্মপাড়ায় যেতে আমার কষ্ট হবে কেন? বরং ভীষণ ভালো লাগবে আমার। অদ্বৈত যে আমার পূর্বপুরুষ! তাঁর কাছে যেতে পারলে আমার যে পুণ্য হবে!'

আইউব সৈয়দ বললেন, 'জলদাসবাবু যথার্থই বলেছেন। আমিও খুব এক্সসাইটেড বোধ করছি। জলদাসবাবুর তো আরও বেশি শিহরিত হবার কথা। চলেন শিবদয়ালবাবু, আমরা এগোই।' জলদাসবাবুর দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করলেন আইউব সৈয়দ।

গোকর্ণঘাটের মালোপাড়ায় পৌঁছে বেশ নাড়া খেলেন অদ্বৈত।

তিন

গোকর্ণঘাটের একেবারে গা ঘেঁষেই মালোপাড়াটি। ঘরে ঘর লাগানো। বেড়ার দেয়াল, ছনে ছাওয়া। কালো মাটি। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পাড়াটিতে ঢুকবার আর বেরোবার একটিই পথ। দুজন মানুষ গায়ে গা লাগিয়ে হাঁটতে পারে ও-পথ দিয়ে। অদ্বৈত অবাক হয়ে দেখলেন—প্যাঁচপেঁচে কাদার ওই পথে ইট বিছানো।

গলির মুখে ত্রিকোনাকৃতির একটা উঁচু বেদিতে কার যেন একটা মূর্তি বসানো। সিমেন্টের। কার মূর্তি এটা? ভাবলেন অদ্বৈত। দেখলেন, মূর্তির ডানপাশের দেয়ালে তাঁর নাম লেখা। একটু রোমাঞ্চিত হলেন তিনি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ এত ভালোবাসে তাঁকে! পাড়ায় ঢোকার মুখেই তাঁর মূর্তি স্থাপন করে তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবার উদ্যোগ নিয়েছে তারা!

অদ্বৈতের হঠাৎ মনে হলো—তিনি অধরচন্দ্রের বড় ছেলে অদ্বৈত নন, তিনি সারদাবালার আদরের ছাওয়াল অদু নন, তিনি যেন এই জেলেপাড়ার অভিভাবক, যেন মালোদের পরিচিতির অভিজ্ঞান! এই পাড়ায় ঢুকতে-বেরোতে নিশ্চয়ই তাঁর মূর্তির দিকে তাকায় মালোরা, টুপ করে দু'একজনে নমস্কারও করে বোধহয়। শেষের কথাটি ভেবে একটু লজ্জা পেলেন অদ্বৈত। এদিক-ওদিক তাকালেন। মুহূর্তের জন্য তিনি ভুলে গেলেন—তাঁকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

মূর্তির সামনে জড়ো হওয়া মানুষজনের মধ্য থেকে মনির হোসেন বলে উঠলেন, 'অদ্বৈতের জন্মভিটাটা দেখবেন স্যার?'

শিবদয়ালবাবু উত্তর দেওয়ার আগে আইউব সৈয়দ বললেন, 'দেখবো মানে! তাঁর পাড়া, তাঁর জন্মস্থান আর এই গোকর্ণঘাট দেখার জন্যই তো চট্টগ্রাম থেকে ছুটে আসা।' বিভোর চোখে চারদিকে তাকাতে তাকাতে কথা শেষ করলেন কবি।

আইউব সৈয়দের কথা শুনে মুচকি একটু হাসলেন শিবদয়ালবাবু। তিনি যে অদ্বৈত-সম্মাননা গ্রহণ করতে এসেছেন, সে-কথা চেপে গিয়ে বললেন, 'সৈয়দ সাহেব যথার্থ বলেছেন। আমারও একই রকম বাসনা।'

এই সময় পাশে দাঁড়ানো একজন বলে উঠলেন, 'চলেন, আমি লইয়া যামু আপনাগো। আমার বাড়ির পাশেই তেনার ভিডাটা।'

শিবদয়ালবাবু লোকটির দিকে তাকালেন। দেখলেন—মাঝারি উচ্চতার লোকটির বয়স পঁয়ষট্টির কম হবে না। মুখমণ্ডলে বলিরেখা। পাকা চুল, ছোট করে ছাঁটা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

শিবদয়ালবাবুর তাকানো দেখে লোকটি হাত জোড় করে বলল, 'আজ্ঞে বাবু, আমার নাম নির্মল মল্লবর্মণ। এই পাড়ার সর্দার। আমার লগে চলেন। আমি সব দেখাইতাছি।'

শিবদয়ালবাবু আট বছর পেছনে ফিরে গেলেন। আট বছর আগে সন্ধের আগে আগে তিনি এই পাড়ায় একবার এসেছিলেন। তখন নির্মল সর্দারের মতো করেই তাঁকে আরেকজন অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, সে লালমোহন বর্মণ। মল্লবর্মণ হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে সে নারাজ ছিল। বলেছিল, 'আমরা হগলে অহন মল্লবর্মণ পদবি লিহি না, শুধু বর্মণ লিহি। মানুষরা আমাগোরে মালাউন বইলে গাইল পাড়ে।'

লালমোহন সেবেলা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবকিছু দেখিয়েছিল। অদ্বৈতের জন্মভিটে, ভিটের ওপর দাঁড়ানো জরাজীর্ণ ছনের ঘরটি, একপাশের পড়ো পড়ো বরই গাছটি, ঘরটির সামনে ছোট্ট উঠানটি আকুল চোখে দেখে গিয়েছিলেন শিবদয়ালবাবু। পরিচয় হয়েছিল মনোমোহিনী আর সুনীলের সঙ্গে। সুনীলের মা বৃদ্ধা মনোমোহিনী বলেছিল, 'আমি অদ্বৈতের দূর-সম্পর্কের বউদি হই। তাই অদ্বৈতের ভিটায় থাকবার অধিকার পাইছি।'

হঠাৎ শিবদয়ালবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, লালমোহন কোথায়? মনোমোহিনী বেঁচে আছে তো?'

নির্মল সর্দার বড় বড় চোখ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এগোরে চিনেন নাকি!'

'হ্যাঁ, চিনি।' মৃদু কণ্ঠে বললেন শিবদয়াল।

'কেমনে চিনেন?'

শিবদয়াল পূর্ণচোখে নির্মল সর্দারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'থাক ওসব কথা। চলেন, আমাদেরকে অদ্বৈতের বাড়িতে নিয়ে চলেন।'

সেসময় শিবদয়ালবাবু নবীনগরে চাকরি করতেন। কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের মাঝারি কর্মকতা ছিলেন তিনি। সকালের দিকে কাজ-দায়িত্ব শেষ হয়ে যেতো, বিকেলবেলায় করার কিছুই থাকতো না। ওই সময় অফিসের কর্মচারী খলিলকে নিয়ে কোনোদিন শিবপুর, কোনোদিন দৌলতপুর যেতেন শিবদয়ালবাবু। এইভাবে একদিন নবীনগর ঘাটে গিয়ে গোকর্ণঘাটগামী জলগাড়িতে উঠে বসেছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিল খলিল।

সাত আটজনের একটা দল নির্মল সর্দারের পিছু পিছু হাঁটতে লাগলেন। শিবদয়ালের পাশে পাশে অদ্বৈত মল্লবর্মণ। নালার কর্দম থেকে পা বাঁচিয়ে, এর ওর চালা থেকে মাথা বাঁচিয়ে দলটি একসময় অদ্বৈতদের উঠানে এসে দাঁড়াল। উঠান তো নয়, যেন এক খাবলা কালো ভূমি! সাত আটজন মানুষেই ভরে গেল জায়গাটি।

অদ্বৈত হা হা করে তাঁর জন্মভিটার দিকে ছুটে গেলেন। তাঁর ভিটায় এখন টিনের ঘর। চারদিকে কিলবিলে বাচ্চাকাচ্চা। ঘরের পাশ ঘেঁষে নারকেল গাছটি দাঁড়িয়ে আছে এখনো।

অদ্বৈত যখন ছোট, সেই সময়ের একদিন আনন্দবাজার থেকে নারকেল চারাটি কিনে এনেছিলেন অদ্বৈতের বাবা অধরচন্দ্র। পুত্রকে বলেছিলেন, 'ওই খালি জায়গায় গাছটা পুঁতে দেও অদ্বৈত।'

বাপে-বেটায় পুঁতে দিয়েছিলেন গাছটি। এই সেই গাছ, যার গায়ে তাঁর বাপের ছোঁয়া আছে। 'বাবা' বলে গাছটিকে জড়িয়ে ধরলেন অদ্বৈত। অনেকক্ষণ পর উঠানে ফিরে এলেন তিনি।

তখন শিবদয়ালবাবু উঠানে জড়ো হওয়া মালোদের উদ্দেশে বলছেন, "অদ্বৈতের বই 'তিতাস একটি নদীর নাম' পড়েছেন আপনারা? সুনীল তুমি দেখেছো বইটি?"

একজন মালো তরুণ বলল, 'আমরা মুরুক্ষ মানুষ, আমরা কী কইরে পইড়বো! অদ্বৈত নামে আমাগো পাড়ার একজন লেখক আছিল, হেইডা শুধু জানি।'

শিবদয়ালবাবু বললেন, 'তোমরা লেখাপড়া করো না কেন? এই দেখো, আমার দিকে তাকিয়ে দেখো। আমিও একজন মালো, জেলে আমি তোমাদের মতো। লেখাপড়া করেছি বলে এই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাকে

সম্মান জানাতে নিয়ে আসা হয়েছে। অদ্বৈতও পড়ালেখা করেছেন বলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষেরা বছর বছর অদ্বৈতমেলা করছেন।'

হঠাৎ রান্নাঘরের ভেতর থেকে একজন নারীর রূঢ় কর্কশ কণ্ঠ ভেসে এল, 'ভাষাণ দিয়েন না, ভাষাণ দিয়েন না! বহুত ভাষাণ হুনছি! অনেকে আইস্যা শুধু ভাষাণ দিয়া যায়! হুনতে হুনতে কান-মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতাছে!'

নির্মল সর্দার ধমক দিয়ে বলল, 'সুনীলের পুতের বউ, কী কইতাছ তুমি এই সব! অদ্বৈত আছেন বইলাই তো আমাগো পাড়ার এত সর্মান! বলি—কোথায় বাস করতাছ তোমরা, হাঁ! যে অদ্বৈত সম্বন্ধে উল্টাপাল্টা কথা কইতাছ, হে অদ্বৈতর ভিডাতেই তো আছো!' নির্মল সর্দারের চোখমুখ দিয়ে ক্রোধ ঝরে পড়তে লাগল।

শিবদয়ালবাবু একেবারে চুপ মেরে গেলেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ হাসবেন না কাঁদবেন, ঠিক করতে পারলেন না।

নত মুখে দলটি অদ্বৈতের মূর্তির পাদদেশে পৌঁছাল। আসবার সময় দেখল, আঠারো বিশ বছরের ছয়-সাতজন মালোসন্তান মূর্তির অদূরে দাঁড়িয়ে জটলা করছে।

এর মধ্যে অদ্বৈতের মূর্তির সামনে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছেন। এসেছেন গোকর্ণঘাট প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্যামসুন্দর পারমানিক, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহমান, এসেছেন ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার মোহাম্মদ আজিজুর রহমান। পুষ্পস্তবক অর্পণ করার আগে এঁরা একটু একটু করে বললেন। সবশেষে বললেন শিবদয়াল জলদাস। তাঁর শেষের লাইনটি ছিল এরকম—'আমার কাছে এই গোকর্ণঘাটের জেলেপাড়াটি গয়া-কাশীর চেয়েও পুণ্যময় স্থান।'

সবাই আনন্দে-উচ্ছ্বাসে হাততালি দিয়ে উঠলেন। এর একটুক্ষণ পর গলির ভেতর থেকে আচমকা হাততালির আওয়াজ ভেসে এলো, সঙ্গে উপহাসের ধ্বনিগুচ্ছ।

অদ্বৈত গলির ভেতরে গলা বাড়িয়ে দেখলেন—গলির মালোসন্তানরা বিকট দেহভঙ্গি করতে করতে উপহাসের হাততালি দিয়ে যাচ্ছে। একজন সম্মানিত মানুষকে অপমান করার জন্য মানুষ যেরকম করে হাততালি দেয় বা দেহভঙ্গি করে, ঠিক সেরকমই এই মালো তরুণদের আচরণ।

অকস্মাৎ অদ্বৈতের মুখের ভেতরটা তেতোতে ভরে গেল। মাথাটা কি একটু চক্কর দিল? বুঝতে পারলেন না অদ্বৈত মল্লবর্মণ। শুধু কিছুক্ষণের জন্য চোখে ঝাপসা দেখলেন তিনি। শিবদয়ালের দিকে চেয়ে দেখলেন অদ্বৈত।

দেখলেন, শিবদয়ালের সারা মুখে স্বেদবিন্দু। এই শীতসকালে শিবদয়াল বাবুর ঘর্মাক্ত হবার কথা নয়। তাহলে ঘামছে কেন সে? মালো তরুণদের উপহাস করার ব্যাপারটি তাহলে সেও টের পেয়েছে? দেখলেন, অন্যরা স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ। বুঝলেন, ওঁরা টের পাননি ব্যাপারটি।

মনে মনে অদ্বৈত শিবদয়ালবাবুর উদ্দেশে বললেন, 'দোহাই তোমার শিবদয়ালবাবু, যা বুঝেছো তা জনসমক্ষে খোলসা করো না। এ যে আমার-তোমার অসম্মান! এই বেদনা আমার-তোমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক। সুনীলের পুত্রবধূর দুঃসহ মন্তব্যটি, মালোসন্তানদের উপহাসের ব্যাপারটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষেরা জানতে পারলে বড় কষ্ট পাবেন।'

মনির হোসেন বললেন, 'আমাদের সকালের প্রোগ্রাম এখানেই শেষ। আজ সন্ধেয় শিবদয়াল স্যারকে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। আগামীকাল সমাপ্তির দিন। আপনারা সবাই উপস্থিত থাকবেন আশা করি।'

চার

ওই সন্ধ্যায় তৃপ্তিময় মন নিয়ে অনুষ্ঠানের দর্শকসারিতে বসেছিলেন অদ্বৈত। সামনের সারির একটা খালি চেয়ারেই বসেছিলেন তিনি। বিশেষায়িত অতিথিবর্গ মঞ্চে উঠে গেলে সামনের সারির বেশ কয়েকটি চেয়ার খালিই পড়ে ছিল। শিবদয়াল জলদাস, আইউব সৈয়দ, ত্রিপুরার কবি দীপ্তেন্দ্র ভৌমিক, ঔপন্যাসিক শ্যামল বৈদ্য, বাচিক শিল্পী পিনাকপাণি চৌধুরী প্রমুখরা সামনের সারির শ্রোতা।

বক্তাদের মুখে তাঁর নাম এবং খ্যাতির কথা শুনতে শুনতে একধরনের বিভোরতা চলে এসেছিল অদ্বৈতের মধ্যে। একটা সময়ে তিনি বুঝতে পারলেন—তাঁর দু'চোখের কোনা ভিজে গেছে। সকালের যত অপমান, যত গ্লানি তাঁর মন থেকে সরে যেতে লাগল। সম্মাননার উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়ার পর সঞ্চালক শিবদয়ালকে তাঁর অনুভূতি প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেছিল। শিবদয়াল মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে অনেক কথা বলেছিলেন।

এই বলে শেষ করেছিলেন তিনি, 'জীবনে অনেক পুরস্কার সম্মাননা পেয়েছি আমি। কিন্তু তিতাসপাড়ের অদ্বৈত মল্লবর্মণের নামের সঙ্গে যুক্ত এই সম্মাননা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম পাওনা। কারণ এই সম্মাননার সঙ্গে আমার পূর্বপুরুষের নাম জড়িত। আমি অদ্বৈতের কাছে, তিতাসপাড়ের মানুষজনের কাছে আজীবন ঋণী থাকলাম।'

অদ্বৈতমেলার তৃতীয় দিন ভোরসকালে আনন্দবাজারটা দেখার খুব ইচ্ছে জেগেছিল অদ্বৈত মল্লবর্মণের। বাপ অধরচন্দ্রের সঙ্গে কতবার যে এই বাজারে মাছ বিকাতে গেছে বালক অদ্বৈত! এই বাজারের কথা মনে হতেই রামপ্রসাদ জেঠার কথা মনে পড়ে গেল অদ্বৈতের। রামপ্রসাদ জেঠা মালোপাড়ার মোড়ল ছিলেন। বড় ভালোবাসতেন তিনি জেলেদের। মালোদের স্বার্থের ওপর কখনো নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখেননি। এই রামপ্রসাদ জেঠাই তো জগৎবাবুর প্রলোভনে সাড়া দেননি। আনন্দবাবু আর জগৎবাবুর কথা বড় মনে পড়ে যাচ্ছে আজ। ছোটবেলায় বাপ অধরচন্দ্রের কাছেই শুনেছিল, রামপ্রসাদ জেঠার নিঃস্বার্থ শক্তমনের গল্পটি।

আনন্দবাবু ও জগৎবাবু—দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার। দুজনেই তিতাসপাড়ে নিজেদের নামে বাজার বসাবার জন্য চেয়েছিলেন। মাছবাজার ছাড়া যে কোনো বাজার জমে না, সেটা উভয়ে জানতেন। জগৎবাবু রামপ্রসাদ জেঠাকে কিনে নিতে চেয়েছিলেন। তিনশ টাকা উৎকোচ দিয়ে তাঁকে নিজের দলে ভিড়াতে চেয়েছিলেন। সেই সময়ের তিনশ টাকা মানে অনেক টাকা! টাকা দেওয়ার প্রস্তাবকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে রামপ্রসাদ জেঠা আনন্দবাবুর বাজারে গিয়ে বসার আদেশ দিয়েছিলেন মালোদের। আনন্দবাজার জমে উঠেছিল, পাশের জগৎবাজার খোঁড়া পায়ে পথ চলেছিল।

একদিনের কথা মনে পড়ে যায় অদ্বৈতের। সেদিন ইয়াবড় একটা কাতলা ধরা পড়েছিল অধরচন্দ্রের জালে। মাছটা আনন্দবাজারে নিয়ে গিয়েছিলেন অধর। সঙ্গে অদ্বৈতও ছিল। আনন্দবাবুর বাজার-সরকার মাছটা নিতে চেয়েছিল।

বলেছিল, 'জমিদারবাবু এই মাছ দেইখে বড় আনন্দ পাইবেন।'

অধরচন্দ্র মূল্য নিতে না চাইলে মস্ত একটা ধমক দিয়েছিল বাজার-সরকার, 'তুমি কি পাগল অইয়া গেইছ অধর! বাবু কি আমার ঘাড়ে মাথা রাইখবেন! তিনি বলে দিছেন, মালোদের হাতে উচিত দাম গছাইয়া তবে মাছ হাতে নিবা।'

ভোরে আনন্দবাজারের তিতাসঘাটে উপস্থিত হয়েছিলেন অদ্বৈত। সামনে শিবদয়াল ও আইউব সৈয়দকে দেখে ভীষণ চমকে উঠেছিলেন তিনি। আরে, এঁরা এখানে কেন! এত সকালে!

শিবদয়ালের কথা শুনতে পেলেন অদ্বৈত। শিবদয়াল বলছেন, "জানেন সৈয়দ সাহেব, এই-ই হলো আনন্দবাজার। তার পাশে নিশ্চয়ই জগৎবাজার আছে। 'তিতাস একটি নদীর নামে' সেই রকমই বিবরণ আছে। আর আছে মেঘনার পাড়ের ভৈরববাজারের কথা। আমি যখন নরসিংদীতে চাকরি

করতাম, সেই ভৈরববাজারে গেছি বহুবার। কিন্তু আনন্দবাজারে আমার এই প্রথম আসা। এই বাজারে এসে আমি বালক অদ্বৈতকে দেখতে পাচ্ছি। তার মতো করে আমিও একসময় আমার বাবার সঙ্গে কমলমুন্সির হাটে যেতাম মাছ বেচতে। আজ এই মাছবাজারের পাশে তিতাস তীরে দাঁড়িয়ে অদ্বৈতের বালকবেলা আর আমার শৈশবকে দেখতে পাচ্ছি।' বলতে বলতে কণ্ঠ বুজে এলো শিবদয়ালবাবুর।

সৈয়দ সাহেব বললেন, 'এই এক অদ্ভুত ব্যাপার দয়ালবাবু! অদ্বৈত আর শিবদয়াল, মালো আর জলদাস, নদী আর সমুদ্র আজ এই সকালের আনন্দবাজারে যেন একাকার হয়ে গেল!' শিবদয়ালবাবুর আবেগে আক্রান্ত আইউব সৈয়দের গলা।

সাঁইত্রিশ বছরের অদ্বৈত ষাটোর্ধ্ব এই দুই প্রবীণের দিকে বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থেকেছিলেন। তাঁর আর আনন্দবাজার ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করেনি। তাঁর মনে হয়েছিল—এই বাজারে এসে তিনি যা পেতে চেয়েছিলেন, তা দুই প্রবীণের কথায় পেয়ে গেছেন। তিনি ফিরে আসার জন্য মনস্থির করেছিলেন।

তো সেই প্রগাঢ় আনন্দটুকু নিয়েই সমাপ্তি দিনের সন্ধ্যায় মঞ্চের সামনে বসেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। বক্তারা কী বলেন, তা শুনতে বড় ইচ্ছে জাগছে তাঁর।

মঞ্চে আজ বিশিষ্টজন। জেলা অধিকর্তা, নিরাপত্তা-প্রধান পদাধিকারের কারণে বিশিষ্ট, স্থানীয় মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, সাহিত্যিক হর্ষবর্ধন পাল নিজেদের গুণে খ্যাতিমান। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা রহিসউদ্দিন বাহুবলের কারণে মঞ্চে আসীন। অদ্বৈতমেলা-আয়োজক সংস্থার মুখ্য আধিকারিক আজকের সমাপনী অনুষ্ঠানের সভাপতি।

জেলা অধিকর্তার নানা কাজ। জরুরি কাজ ফেলে তিনি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। মঞ্চে উঠেই সভাপতিকে নিচু কণ্ঠে বলে দিয়েছেন, তাঁকে আগে ছেড়ে দিতে হবে। প্রটোকল ভেঙে তাঁকেই প্রথমে বলতে দেওয়া হলো। অদ্বৈত ভাবলেন—জরুরি কাজের কাছে প্রটোকল গৌণ। জেলা অধিকর্তার কথা শুনবার জন্য তিনি একটু নড়েচড়ে বসলেন।

অধিকর্তা বললেন, 'ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শান্তি বিরাজমান ছিল। কিন্তু কিছু বিপথগামী মানুষের উগ্র সাম্প্রদায়িকতার কারণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আজ উত্তুঙ্গ ঢেউয়ের সম্মুখীন হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অহংকারের জায়গা, উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গীত ভবনে লঙ্কাকাণ্ড চালানো হয়েছে।'

ভাষণ শুনতে শুনতে অদ্বৈতের মনে হলো—ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র এবং তাঁর ওপর বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট প্রভাব আছে। নইলে কেন ভাষণে এত তৎসম শব্দের ছড়াছড়ি!

অধিকর্তা বলে চলেছেন, 'মালোরা নিরীহ মানুষ। তারা কখনো কারও ক্ষতিসাধন করে না। দিন এনে দিন খাওয়া মানুষগুলোও রেহাই পায়নি। সাম্প্রদায়িক করালগ্রাসে পতিত হয়েছে তারাও। নাসিরনগরে তাদের ঘরবাড়ি ছারখার করা হয়েছে, উপাসনালয়ও তাণ্ডবতা থেকে মুক্তি পায়নি।'

শুনতে শুনতে অদ্বৈতের মনে হলো, এখনই ছুটে যান তিনি নাসিরনগরে, গিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের মানুষদের পাশে দাঁড়ান। তিনি আবার ভাবলেন—নাসিরনগরে গিয়ে লাভ কী? তাঁকে তো কেউ দেখতে পাবে না, তাঁর কণ্ঠস্বর তো কেউ শুনতে পাবে না! শুধু শুধু যাওয়া তাঁর। গেলে বেদনার বিশাল এক জগদ্দল পাথর তাঁর বুকে চেপে বসবে। সর্বস্বান্ত মালোনারীদের হাহাকারে তাঁর সমস্ত অন্তঃকরণ বেদনায় চুর চুর হতে থাকবে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ জোরে জোরে শ্বাস টানতে শুরু করলেন। তাঁর যেন শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে! একসময় চোখ বন্ধ করে বুকটা হাত দিয়ে চেপে ধরলেন তিনি। কখন জেলা অধিকর্তার বক্তৃতা শেষ হয়েছে, খেয়াল করেননি অদ্বৈত। তিনি যখন স্বস্তিতে ফিরলেন, তখন অধ্যক্ষ মহোদয় মাইকের সামনে কথা বলছেন।

তিনি বলছেন, 'অদ্বৈত মলবরমন আমাদের সম্পদ।'

পেছনে দাঁড়ানো সঞ্চালক চাপা স্বরে বলল, 'মলবরমন নয় স্যার, মল্লবর্মণ।'

অধ্যক্ষ মাইকেই বললেন, 'আমি মৃত্তিকাবিজ্ঞানের লোক। উচ্চারণে একটু ভুলচুক হতে পারে।'

এরপর তিনি দর্পিত কণ্ঠে বক্তৃতা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

অদ্বৈত মনে মনে বললেন, 'কী আশ্চর্য! মল্লকে মল, মানে বিষ্টার সঙ্গে তুলনা করেও ভদ্রলোকের বিন্দুমাত্র আফসোস নেই!'

অধ্যক্ষ সাহেবের বক্তৃতা শেষ হলে প্রধান অতিথি নিরাপত্তা-প্রধান বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। দীর্ঘদেহী, পাতলা কাঠামো তাঁর। মাইক-স্ট্যান্ডটা সর্বোচ্চ উচ্চতায় তোলা হলো। তারপরও তাঁকে মাথা নুইয়ে বলতে হচ্ছে। তাঁর বাড়ি বোধহয় চাঁপাইনবাবগঞ্জের দিকে। উচ্চারণে 'স' 'ছ'-এর সমস্যা আছে।

তিনি বললেন, 'ছবাইকে আমার ছালাম ছুভেচ্ছা জানাচ্ছি।'

দর্শক-শ্রোতার মধ্য থেকে চাপাহাসির গুঞ্জরণ উঠল।

তিনি বলে যেতে লাগলেন, "আদিত্য মল্লবর্মণ একজন কবি মানুষ। এই ব্রাহ্মণবাড়িয়ারই ছন্তান তিনি। তবে শেষ জীবনে একখানা কাহিনি লিখেছিলেন। সেই কাহিনির নাম রেখেছিলেন—'তিতাছ একটি নদীর নাম'। বইখানা আমরা ছিনামায় দেখেছি।"

ভদ্রলোকের বক্তৃতা শুনে অদ্বৈত মল্লবর্মণের ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা। তিনি আবার কবি হলেন কখন! প্রথম যৌবনের টানে আটদশখানা পদ্য লিখেছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলো যে কবিতা হয়ে ওঠেনি, তা কলকাতার সুহৃদরা বলেছিল। তারা বলেছিল, 'অদ্বৈত, পদ্যলেখা ছাড়ো, অন্য কিছু লেখো।'

তাদের কথা শুনেই-না একদিন কাহিনি লিখতে বসেছিলেন তিনি। প্লট খুঁজতে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি। নিজের জীবন, সেই জীবনকে ঘিরে গোকর্ণঘাটের মালোসমাজ, আশপাশের মানুষজনকে তিনি তাঁর লেখার বিষয়-আশয় করেছিলেন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' লেখার পর মানুষেরা তাঁকে ঔপন্যাসিক বলা শুরু করেছিল। নিরাপত্তা-প্রধান এই বইখানা সিনেমায় দেখেছেন, পড়েননি কখনো! হায় রে দুর্ভাগ্য! আর আদিত্য মল্লবর্মণ কে!

ভদ্রলোক তখনো বলে চলেছেন, 'এই আদিত্যের কাছ থেকে আমরা অছাম্প্রদায়িকতার ছিক্ষা নিতে পারি। বইখানা দিয়ে আদিত্য বলে গেছেন—ছব ছম্প্রদায়ের মানুছ মিলেমিছে থাকা ভালো। তিনি রাজনীতিবিদ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর লেখাগুলি ছিল রাজনীতিবিদের লেখার মতন।' বলে ঘাড় ঘুরিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাটির দিকে তাকালেন তিনি। নেতার মুখে তৃপ্তির হাসি।

নিরাপত্তা-প্রধান বলছেন, 'রাজনীতিকরা যেমন ছর্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে ছর্বদা ছচেতন থাকেন, কাজ করেন যেমন ছাধারণ মানুষের মধ্যে, আদিত্য মল্লবর্মণও তাঁর বইটি দিয়ে ছেরকম কাজ করে গেছেন।'

হঠাৎ অদ্বৈত মল্লবর্মণের গলা ফেটে বমি আসতে চাইল। এই দুঃসময়েও তাঁর চোখ চলে গেল শিবদয়াল জলদাসের দিকে। দেখলেন—শিবদয়াল দুই হাত দিয়ে কান দুটো ঢেকে মাথা নিচু করে বসে আছেন, আইউব সৈয়দের চোখ-মুখ লজ্জায় বিবর্ণ। এরপর অদ্বৈত চোখ ঘোরালেন মঞ্চে বসা সাহিত্যিক হর্ষবর্ধনের দিকে। হর্ষবর্ধনের তখন কাঁদতে বাকি।

অনেক চেষ্টা করেও অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিবমিষাকে দমন করে রাখতে পারলেন না। ছুটে গেলেন গেটের দিকে। গেটের বাইরে বড় একটা নালা। সেই নালার পাড়ে অদ্বৈত উপুড় হয়ে বসে পড়লেন।

পাঁচ

গভীর রাত।

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে।

যে যাঁর ঘরে চলে গেছেন।

খোলা মঞ্চটি পড়ে আছে।

মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তাঁর মন বিষণ্ন, সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ।

বড় আশা নিয়ে সাতষট্টি বছর পরে ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে দেখবার জন্য এই মর্ত্যে এসেছিলেন অদ্বৈত। কিন্তু এই দুই দিনে তাঁর মনের আশা মিটে গেছে। সাতদিনের ছুটি নিয়ে এলেও এখানে তাঁর আর থাকতে ইচ্ছে করছে না। মালোপাড়ার মানুষজনের মন্তব্য-আচরণ, শিক্ষিত মানুষদের কথাবার্তা তাঁর মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে।

অদ্বৈতের মনে হলো, আর কিছুদিন এখানে থাকলে অস্থিরতায় আক্রান্ত হবেন তিনি।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ঠিক করলেন—আর নয় এই পৃথিবীতে। তিনি ফিরে যাবেন। সুখৈশ্বর্যের বেদনায় দীর্ণ স্বর্গে ফিরে যাবেন তিনি।

কুন্তীর বস্ত্রহরণ

এক

সেরাতে 'মহাভারত' পাঠের আসর বসেছে মালোপাড়ায়।

চাঁপাতলা গাঁয়ের একটেরে মালোপাড়টি। শ'খানেক মালোপরিবারের বসবাস এ পাড়ায়। ক'শ বছর ধরে এই চাঁপাতলা গাঁয়ে মালোরা বসবাস করছে, তার সঠিক সুলুকসন্ধান দিতে পারে না কেউ। এক এক জনের এক এক দাবি।

সুনীল সরকার বলে, 'শ'তিনেক বছর তো হইবেই।'

অজয় মণ্ডল বলে, 'কী যে কও না ভাইপো! কত যুগ যুগ ধইরে যে এই চাঁপাতলায় আমাদের পূর্বপুরুষরা বাস কইরে আইসছে, তার কোনো হিসেব-নিকেশ আছে! কম কইরে অইলেও তো পাঁচশ বছরের মালোকাহিনি এই পাড়ার আকাশে-বাতাসে। ওই যে বড় তেঁতুল গাছটা দেইখছ, বাবা বইলছিল ছোডবেলায়, ওই গাছটা লাগাইছিল আমার বাপের দাদার দাদার দাদায়। তয়, আমার বয়স চাইর কুড়ি পুরাইল সেই দিন। ভাইবে দ্যাখ, এই পাড়ার বয়স কত হইল!'

অজয় মণ্ডল আবেগি মানুষ। বিয়েথা করেনি। প্রথম যৌবনে মাছ ধরত ভৈরব নদে। বয়স যৌবনের ওপারে গেলে গান-কীর্তনে ঝুঁকে পড়ল। কীর্তনীয়াদল নিয়ে এগাঁয়ে ওগাঁয়ে নামকীর্তন করে বেড়াত। তারপর তো বয়সটা চেপে ধরল অজয়কে। কীর্তন গাওয়া ছেড়ে দিল। মশগুল হলো 'মহাভারত' নিয়ে।

সন্ধ্যায় নিজ দাওয়ায় 'মহাভারত' খুলে বসত। গুন গুন করে কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' পড়ত। সেই পাঠে এসে উপস্থিত হলো শান্তনু। শান্তনু সরকারের বয়স চল্লিশের আশেপাশে। বড় সুরেলা কণ্ঠ শান্তনুর। যেন কণ্ঠে সরস্বতী বসা! এক সন্ধ্যায়, অনেক মানুষের সামনে 'মহাভারত'টা শান্তনুর দিকে ঠেলে দিয়ে অজয় মণ্ডল বলেছিল, "আইজ থেইকে ভাইপো তুই-ই পাঠ করবি 'মহাভারত'। বড় অহংকার ছিল মনে। ভাবতাম—আমার মতো গাইয়ে নেই এই ভূমণ্ডলে। ভগবান তোরে পাঠায়ে আমার দর্প চূর্ণ কইরল।

তোর মতো সুরদাসকে পাঠায়ে দিল আমাদের কাছে। আজ থেইকে এই আসরে তুই 'মহাভারত' পাঠ কইরবি আর আমি বুঝাইয়া দিব মানুষেরে।"

সেই সন্ধ্যা থেকে 'মহাভারত' পাঠ করে শান্তনু, ব্যাখ্যা করে অজয় মণ্ডল, মানে এ পাড়ার অজয় জেঠা।

আগে আগে অজয় মণ্ডলের দাওয়াতেই শুধু পাঠের আসর বসত। এখন তা ছড়িয়ে গেছে গোটা পাড়ায়। এক এক সন্ধ্যায় এক এক জনের বাড়িতে 'মহাভারত' পাঠ হয়। শ্রোতাও কম হয় না, এ আসরে। চাঁপাতলার মালোপাড়ায় এখন 'মহাভারত' পাঠ হয় ঘটা করে।

আজ 'মহাভারত' পাঠ হচ্ছে কুন্তীর উঠানে।

কুন্তীর বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। কুন্তীর স্বামীর নাম ভীষ্ম। মালোদের নাম পুরাণঘেঁষা। 'রামায়ণ'-'মহাভারত' তাদের নামের উৎস। গৌর, নিতাই, দ্বারকা, মথুরা, রাধা, যশোদা, বলরাম, কৃষ্ণ, উর্বশী, সুমিত্রা—এরকমই নাম রাখে তারা। তাই কুন্তীর স্বামীর নাম ভীষ্ম হওয়া খুব অবাক হবার ব্যাপার নয়। 'মহাভারতে'র ভীষ্ম চিরকুমার। মালোভীষ্ম চিরকুমার নয়। বিয়ের বয়স হলে মালোভীষ্মের সঙ্গে কুন্তীর বিয়ে হয়।

ভীষ্মের ঘরে চার পুত্র। কুন্তী তার পুত্রদের নাম রেখেছে—যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল, সহদেব।

হাসতে হাসতে কুন্তী বলে, 'আরেকটা ছাওয়াল অইলে নাম রাইখতাম ভীম।'

মথুরাবালা মুচকি হেসে বলে, 'তোমারে মানা করে কে?'

কুন্তী হাসিকে চোখ পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে নিজের পেটের দিকে ইশারা করে বলে, 'জমি ঠা ঠা অইয়ে গেছে। আর হওনর সুযোগ নাই।'

কুন্তীর বাপ ছিল পালাকার। দেশে দেশে রাবণ বধ, কর্ণকুন্তী সংবাদ, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, ভীষ্মের শরশয্যা—এসব পালা গেয়ে বেড়াত কুন্তীর বাপ। বাপের রক্ত কুন্তীর শরীরে। 'মহাভারতে'র কাহিনি তাকে হাসায়, কাঁদায়। কাহিনি শুনতে শুনতে তার মধ্যে কত শত প্রশ্ন জাগে! প্রশ্ন জাগলেই অজয় জেঠাকে জিজ্ঞেস করে। অজয় জেঠার উত্তরে কুন্তী সবসময় সন্তুষ্ট হয় না। অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন তার মনের মধ্যে গুমরে মরে।

কুন্তী অজয় জেঠার মহাভারত-আসরের নিয়মিত শ্রোতা। খুব বড় অসুখবিসুখ না করলে বা পারিবারিক কোনো কঠিন সমস্যায় না পড়লে, কুন্তী উপস্থিত থাকে প্রতিটি আসরে।

আজ শান্তনু পড়ছে 'সভাপর্ব্ব'। গত কয়েকদিন ধরে বড় বেদনা শ্রোতাদের মনে। ক'দিন ধরে 'সভাপর্ব্ব' পাঠ চলছে আসরে। এই পর্বে মহাভারতের যত বেদনা, যত বিষাদ। এই পর্বেই মহাভারতের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। শ্রোতারা গেল ক'দিন ধরে কুরুদের চালাকি, শকুনির ধূর্তামি, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের অসহায়তা আর নিষ্ক্রিয়তার কথা শুনেছে। ধর্মের যতই দোহাই দেওয়া হোক, বলা হোক নিয়মনীতির কথা, যুধিষ্ঠির যে একজন জুয়াড়ি এবং অদক্ষ জুয়াড়ি, সেটা অন্যরা না মানুক, কুন্তী মানে। যে অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির অন্য চার ভাইসহ দ্রৌপদীকে বাজি ধরেন, সেই অধ্যায়েই, পাঠের মাঝখানে, কুন্তী বলে ওঠে, 'যুধিষ্ঠির তো জুয়াড়ি! লজ্জাশরম নাই তার। থাকলে কী আর বউয়েরে বাজি ধরে!'

সেরাতে শান্তনু পাঠ করছিল। জেঠা বুঝাচ্ছিল—যুধিষ্ঠির একে একে সব ভাইকে পাশায় হারালেন। তারপর নিজেকে বাজি ধরলেন। যুধিষ্ঠিরের মতিভ্রম হয়েছে। নইলে শকুনির চাল বুঝতে পারবেন না কেন? নিজেকে হারানোর পর শকুনি দ্রৌপদীকে বাজি ধরার জন্যে যুধিষ্ঠিরকে প্ররোচিত করল। প্রথমে দোনামনা করলেও শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীকে বাজি ধরলেন যুধিষ্ঠির। শান্তনু সুর করে পড়ছে—

এতেক শুনিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির।
পাশা ফেল আরবার সেই পণ স্থির ॥
এতেক শুনিয়া দুষ্ট পাশা ফেলাইল।
হাসিয়া শকুনি বলে জিনিল জিনিল ॥
শুনি কর্ণ দুর্যোধন হাসে খল খল।
মহা আনন্দিত কুরু-সোদর সকল ॥

কুন্তীর মন্তব্যের কোনো উত্তর দিতে পারেনি অজয় জেঠা, সে বেলায়। বড় কঠিন প্রশ্ন কুন্তীর, বড় যৌক্তিক জিজ্ঞাসা! আবেগমথিত হয়ে কুন্তীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। বলা যায়—যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কখনো ভুল করেন না। তিনি যা করেছেন—ধর্মানুকূলে থেকেই করেছেন। সেখানে কোনো প্রশ্ন করা যায় না।

কিন্তু কুন্তী তো বাস্তবতার নিরিখে উত্তরটা জানতে চেয়েছে! বাস্তবতা আর অন্ধ আবেগের মধ্যে বিস্তর ফারাক। কুন্তীর মন্তব্যকে মেনে নিলে ধর্মকে অপমান করা হয়, আর পুরাণকে মেনে নিলে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয়। বড় দোটানায় পড়ে গেল অজয় মণ্ডল।

নিচের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কুন্তী, তোমার প্রশ্ন বড়ই বাস্তব, বড়ই কঠিন। আজ তোমার এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিব না। আর একদিন, অন্য কোনো আসরে তোমার মন্তব্যের উত্তর দিব আমি।'

ওখানেই সমাপ্ত হয়েছিল সেদিনের পাঠ।

দুই

আবুল কাশেম চেঙ্গুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে আবুল কাশেম। সর্বদা টুপি রাখে মাথায়। গালিগালাজের সময় টুপি মাথা থেকে নামিয়ে নেয়। বলে, 'টুপি মাথায় রেইখে শাসন করা যায় না। শাসন করার সময় তো আর মুখ দিয়া মিডা মিডা কথা বাইর অয় না!'

একাত্তরের রাজাকার এই আবুল কাশেম। এখন ধোয়া তুলসীপাতা। যুদ্ধের শেষদিকে গ্রাম থেকে পালিয়েছিল। পঁচাত্তরে হাওয়া বদলে গেল। রাজাকাররা দেশকর্তা হলো। আর দেশপ্রেমিকরা কোলাবরেটরের কলঙ্ক নিয়ে এলাকা ছাড়ল। ক্রমে ক্রমে আবুল কাশেম মাথা তুলল। পালিয়ে যাওয়া অথবা চুপ মেরে থাকা আলবদর আলশামসরা আবুল কাশেমের চারদিকে একটা বলয় তৈরি করল। আবুল কাশেম প্রথমে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার হলো। পরের বার চন্দ্রকান্ত চৌধুরীকে জানের ভয় দেখিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলো। সেই থেকে অনেক বারের চেয়ারম্যান আবুল কাশেম। কেউ সাহস করে না, তার বিরুদ্ধে ইলেকশনে দাঁড়াতে। চেঙ্গুটিয়া ইউনিয়ন তার কথায় ওঠে, তার ইচ্ছেতেই বসে।

আবুল কাশেম চেয়ারম্যানের চোখ পড়েছে মালোদের শ্মশানের ওপর। ভৈরব নদের পাড়ে শ্মশানটি। বহু বহু বছর পূর্ব থেকে এখানে মালোরা দাহকার্য সম্পন্ন করে আসছে। বড় সুন্দর জায়গা! নানা ধরনের গাছ শ্মশান জুড়ে। সেগুন গাছই বেশি। গাছের দাম বর্তমান বাজারমূল্যে কোটি টাকার কাছাকাছি। চেয়ারম্যান চায়—ও জায়গায় একটা বাগানবাড়ি বানাতে। বিপুল গাছগাছড়ার মাঝখানে সুন্দর একটা চৌচালা বাগানবাড়ি। সামনে বিরাট উঠান। উঠানে নরম ঘাস। একটা পুকুরও কাটাবে আবুল কাশেম। পড়ন্ত বিকেলে পুকুরপাড়ে বসে তসবি পড়তে পড়তে মাছেদের খেলা দেখার বড় সাধ আবুল কাশেমের।

একদিন মালোপাড়ায় উপস্থিত হলো আবুল কাশেম। মালোদের ডেকে বলল, 'দ্যাখ মালোর পো-রা। ওই জায়গাটা আমার খুব পছন্দ হইয়েছে। ওইখানে আমি একটা এবাদতখানা কইরব। মানুষ পোড়াবার জইন্য তো

অত বড় জায়গার দরকার নাই! আমি তোমাদের জইন্য একটা শ্মশানখানা গইড়ে দিচ্ছি। দেয়ালও কইরে দিমু চাইরদিকে। কাছে তো নদী থাইকবেই। কী বলো মালোর পুতরা, রাজি তো তোমরা?'

অজয় মণ্ডল, শান্তনু, সুধাংশু, দুলাল বিশ্বাসরা চুপ করে থাকে। ওরাই মালোপাড়ার মাথা। মাথাদের মাথা হেঁট দেখে আবুল কাশেমের জোশ বেড়ে যায়।

বলে, 'চুপ থাইকো না তোমরা। ভাবাভাবির দরকার নাই। যা বইলেছি রাজি অইয়া যাও। লাভ ছাড়া লোকসান অইব না তোমাদের।'

হঠাৎ করে ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে আসে কুন্তী। সামান্য ঘোমটা টেনে বলে, 'এ কী কইতাছেন চেয়ারম্যান সাব! পুস্তপুরুষের শ্মশান আমাদের! আমাদের বাপ-দাদা, তাদের মা-বাপ, কত শত আত্মীয়স্বজনের স্মৃতি জড়াইয়া আছে ওই শ্মশানের লগে! আপনি কী কইরে বলেন ওই শ্মশান ছেইড়ে দিতে!'

আবুল কাশেম ভ্যাবাচেকা খায়। কেউ, বিশেষ করে কোনো নারী তার প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে, আশা করেনি আবুল কাশেম। চোখের কোনা জ্বলে ওঠে তার। তবে তা সামান্য সময়ের জন্যে। নিজেকে সামলে নিয়ে পাশে দাঁড়ানো ফখরে আলমের দিকে তাকায়।

ফখরে আলম কাশেমের পদলেহি। ভীষণ বুদ্ধি রাখে সে। বড় বড় সংকটে এই ফখরে আলমের বুদ্ধিতে পার পেয়ে গেছে আবুল কাশেম। ফখরে আলম যেন 'মহাভারতে'র শকুনি! শকুনি যেমন সর্বদা দুর্যোধনের পাশে পাশে থেকে কুবুদ্ধি জোগাত, ফখরে আলমও আবুল কাশেমের সঙ্গে সঙ্গে থেকে বুদ্ধি আর কুবুদ্ধি জোগায়।

ফখরে আলম বলে ওঠে, 'ভীষ্মের বউ কুন্তী হুজুর।'

তারপর চাপা স্বরে বলে, 'মালোপাড়ার জয়নাব হুজুর। বাচ্চাকাচ্চা অইলে কী অইবে, দেইখতে কচি ডাব হুজুর।'

তার পর গলা উঁচু করে বলে, 'এই পাড়ার মালোরা কুন্তীরে বড় মানে হুজুর।'

যা বোঝার আবুল কাশেম বুঝে গেল। কণ্ঠকে একেবারে খাদে নামিয়ে বলল, 'দ্যাখ বেটি, যদিও পুরুষ থাইকতে মাইয়া মাইনষের লগে কথা কওয়া আমি পছন্দ করি না, তারপরও শুইনলাম—তোমারে এপাড়ার মালোরা ভক্তি শ্রদ্ধা করে, তাদের শ্রদ্ধায় আস্থা রাইখাই বইলছি—তোমাদের শ্মশানটা অতি জংলা, সাপখোপের আস্তানা। এখানে ওখানে জলজলা।

একপাশে নদীভাঙন। বলি কী, ইটার পরিবর্তে বাঁধানোশ্মশান বানাইয়া দিব তোমাদের।'

'দরকার নাই আমাদের বাঁধানো শ্মশানের! পূর্বপুরুষের শ্মশান আমাদের মাথায় থাক। ওই শ্মশানের দিকে কুনজর দিবেন না চেয়ারম্যান সাব।' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল কুন্তী।

অবাক বিস্ময়ে চোখ বেরিয়ে আসতে চাইছে আবুল কাশেমের। কী বলবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না সে!

পাশ থেকে ফখরে আলম চাপা স্বরে বলল, 'সাবধান হুজুর, মাথা গরম কইরবেন না। যা বইলবেন ঠান্ডা মাথায় বইলবেন।

এই সময় মালোদের মধ্যথেকে আওয়াজ উঠল, 'কুন্তী ঠিক বইলেছে চেয়ারম্যান সাব। ওইটা আমাদের পবিত্র জায়গা। ওইটার দিকে চোখ দিবেন না।'

মিষ্টি হেসে আবুল কাশেম বলল, 'তোমাদের পালস বুঝি আমি। দ্যাখ, মানুষ ভালাই চায়। একটা খারাপকে ছেইড়ে একটা খুব ভালারে পাইতে তোমাদের আপত্তি ক্যান বুইঝলাম না! আর তুমিও মাইয়া, এতগুলা পুরুষ থাইকতে তুমিও ক্যান যে মাঝখানে কথা বইলতে গেলা, বুইঝতে পাইরলাম না!' কুন্তীর দিকে চোখ রেখে কথা শেষ করল চেয়ারম্যান।

'ওরে ধমকাইবেন না চেয়ারম্যান সাব। কুন্তী মাসি আমাদের মনের কথাই বইলেছে!' সুনীল সরকার ভিড় থেকে বলে উঠল।

'শোনো মালোর পুত। যতই হই চই কর, তোমাদের হাঁড়ির খবর রাখি আমি। এই যে মালোপাড়ায় তোমরা বসবাস কইরতেছ, বাস্তুভিডার কোনো দলিল-দস্তাবেজ আছেনি তোমাদের কাছে? নাই। শ্মশানের দলিলের কথা নাই-বা বইল্লাম।'

তারপর মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিল আবুল কাশেম। সমবেত জেলেদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই ভূমি আমার। আমার বাবায় একসময় জমিদার নগেনবাবুর কাছ থেইকে কিন্যা নিছিল ওই শ্মশানটা। দলিল আছে আমার কাছে। তোমাদের চার মাস সময় দিয়া গেলাম। ওই জায়গা ছাইড়বে তোমরা। আর হ্যাঁ, আজ থেইকে কোনো মড়া পোড়াইবে না তোমরা ওইখানে।'

কথা শেষ করে পেছন ফিরল আবুল কাশেম। তার পেছনে ফখরে আলম। ফখরে আলমের পেছন পেছন সাঙ্গাতরা।

দল থেকে দু'কদম এগিয়ে তৌহিদ জিজ্ঞেস করে, 'ফখরে ভাই, এই যে চেয়ারম্যান সাহেব কইলেন, ওনার বাবা জমিদারবাবুর কাছ থেইকে

শ্মশানডা কিইনে নিছেন, কথাটা সইত্য নাকি? বাপের কাছে শুইনেছি—চেয়ারম্যানের বাবা নাকি কামলাগিরি কইরত বেলেডাঙ্গার শ্যামসুন্দরবাবুর জমিতে।'

'খবরদার হারামির বাইচ্চা! আর একটা কথা বইলছস তো জিহ্বা বাইর কইরা নিমু। না-ও কিনে যদি, কিনতে কতক্ষণ রে হারামজাদা! দ্যাশ আমাদের। সামনের ইলেকশনে আমাদের দলই ক্ষেমতায় আইবো। দলিল বানাইতে কতক্ষণ লাগে রে হালারপোত!' ফখরে আলম গর্জে ওঠে।

ফখরে আলমের গলা শুনে আবুল কাশেম পেছন ফিরে। জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

ফখরে আলম বলে ওঠে, 'ও কিছু না হুজুর। তৌহিদ্যার এলেম কম। তারে এলেম দিচ্ছিলাম। গলাটা উঁচু অইয়ে গেল একটু। মাফ করেন হুজুর।'

আবুল কাশেম মুচকি হাসে। হাঁটতে হাঁটতে দুজনের কথা শুনেছে সে। ফখরে আলমের কথা শুনে দিল খুশ হয়ে গেল তার। ফখরের উপস্থিত বুদ্ধি অতি চমৎকার। এজন্য পছন্দ করে সে ফখরে আলমকে।

তিন

তাঁরা তিন ভাই—ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর। তিনজনই অবৈধ সন্তান। কিন্তু রাজমাতা সত্যবতী কর্তৃক স্বীকৃত। পিতা একজন—মহাভারতরচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস। ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু রাজবধূর গর্ভে জন্মালেও বিদুরের মা দাসী। রাজসভায় তাই বিদুর অবহেলিত। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ, পাণ্ডু প্রজনন ক্ষমতারহিত।

ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র। পাণ্ডুর পাঁচ। এই পাঁচজনের জন্ম আবার পাণ্ডুর ঔরসে নয়। পাণ্ডুর পুত্রদের পাণ্ডব বলা হয়। ধৃতরাষ্ট্রের শাসনে থাকলে কী হবে—রাজ্যাধিকার পাণ্ডবদেরও আছে। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রান্ধ। জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধনের ধমকানিতে সবার বড় হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করতে অস্বীকৃতি জানালেন ধৃতরাষ্ট্র। ইন্ধন জোগাল শকুনি।

পাণ্ডুর মৃত্যু হয়েছে অনেক আগে। পাণ্ডবরা যৌবনপ্রাপ্ত হলে রাজ্যাধিকার চাইলেন। পাঁচখানি গ্রাম দিতেও রাজি হলেন না ধৃতরাষ্ট্র। উপরন্তু ধনে-প্রাণে নিঃস্ব করতে চাইলেন পাণ্ডবদের। এ কাজে প্রধান ভূমিকা রাখল দুর্যোধন। শকুনির প্ররোচনায় পাশাখেলার আয়োজন করা

হলো। রাজসভায় আনা হলো পঞ্চপাণ্ডবকে। কুযুক্তি ও কূট ভাষার মারপ্যাঁচে যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় মগ্ন করানো হলো।

খেলায় দক্ষ ছিলেন না যুধিষ্ঠির। শকুনি পাশাবিদ। তার চালে যুধিষ্ঠির একে একে ধন, রাজ্য, হর্ম্য—সবই হারালেন। বাকি থাকলেন স্বয়ং তিনি, অন্য চার ভাই এবং স্ত্রী দ্রৌপদী।

শকুনি জিজ্ঞেস করল, 'অতঃপর কীসের পণ করবে ভাগনে?'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'ভাইদের অঙ্গে যত অলঙ্কার আছে, তা সবের পণ করলাম।'

পাশার চালে শকুনি তাও জিতে নিল। ক্রূর হাসি ছড়িয়ে পড়ল দুর্যোধন ও অন্যান্য কুরুভ্রাতার মুখে।

শকুনি বলল, 'অতঃপর?'

'আমার কাছে পণ করার মতো আর কিছুই নেই।' করুণ কণ্ঠে যুধিষ্ঠির বললেন।

'আছে, আছে তো ভাগনে! তোমার ভাইয়েরা আছে না!' শকুনি ত্বরিত বলল।

তারপর যুধিষ্ঠির একে একে ভাইদের পণ ধরলেন। হারলেন। তারপর নিজকে পণ ধরলেন। পাশাখেলায় নিজেকে হারিয়ে চার ভাইসহ কুরুবংশের দাসে পরিণত হলেন।

কর্ণ উচ্চৈঃস্বরে হেসে বলল, 'এবার কাকে পণ করবে যুধিষ্ঠির?'

দুর্যোধন বলল, 'কী যে বলো না মিত্র! দ্রৌপদীর মতো সুন্দর স্ত্রী থাকতে জ্যেষ্ঠের আবার চিন্তা কীসের! এবার নিশ্চয়ই জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্রৌপদীকে বাজি ধরবেন।'

এই সময় শকুনি বলে উঠল, 'ভাগনে দুর্যোধন, তোমার মতিভ্রম হয়েছে। রূপেতে লক্ষ্মীর সম যাহার বর্ণনা/ অসংখ্য যাহার গুণ না হয় গণনা—সেরকমের দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠির কখনো পণ করবে না। আর যদি দ্রৌপদীকে বাজি ধরেও-বা আমাদের পরাজয় নিশ্চিত। কারণ দ্রৌপদী কখনো হারানোর নয়।'

যুধিষ্ঠির বুদ্ধি হারালেন। দ্রৌপদীকে বাজি ধরলেন। শকুনির কূটচালে দ্রৌপদীকেও হারালেন যুধিষ্ঠির।

দুর্যোধন প্রতিকামী পাঠাল দ্রৌপদীকে আনবার জন্যে।

দ্রৌপদী তখন ইন্দ্রপ্রস্থে। ইন্দ্রপ্রস্থ পাণ্ডবদের রাজধানী। প্রতিকামী ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে দ্রৌপদীকে সভাস্থলে নিয়ে এলো।

দুর্যোধন দ্রৌপদীর রূপে বিভোর। কামাগ্নিতে তার ভেতরটা পুড়ছে তখন। ভাই দুঃশাসনকে বলল, 'নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছো কেন দুঃশাসন? বিবস্ত্র করো দ্রৌপদীকে। নয়নের সুখ মিটাই।'

তারপর জানুর বস্ত্র উন্মোচন করে সেখানে ডান হাতে মৃদু আঘাত করে দুর্যোধন আবার বলল, 'তারপর দ্রৌপদীকে এখানে বসিয়ে দেহের তাপ কমাব।'

চার

আসরের সবাই অশ্রুসজল। বাকরুদ্ধ অজয় মণ্ডল। কুন্তীর ক্রোধান্বিত চোখ। শান্তনু পড়ছে—

একবস্ত্র পরিহিতা দ্রৌপদী সুন্দরী।
দুঃশাসন টানিতেছে বসনেতে ধরি ॥
ছাড় ছাড় বলি কৃষ্ণা ঘন ডাক ছাড়ে।
সভামধ্যে ধরি তার অঙ্গ-বস্ত্র কাড়ে ॥
সংকটে পড়িয়া দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া কৃষ্ণা স্মরে যদুরায় ॥
ঝরঝর ঝরে অশ্রুজল দু'নয়নে।
কাতরেতে কৃষ্ণা ডাকে দেব নারায়ণে ॥

কুন্তী চিৎকার দিয়ে উঠল, 'থাম, থাম শান্তনু। আর পইড়ো না। আর শুইনতে ভালো লাগে না।'

তারপর অজয় মণ্ডলের দিকে ফিরে বলে, 'নারীর অপমানের কথা ব্যাখ্যা কইরো না জেঠা।' বলতে বলতে কেঁদে দিল কুন্তী।

অজয় মণ্ডল শান্ত স্বরে বলল, 'শান্ত হও কুন্তী, শান্ত হও। কাঁইদো না।'

'কী ভাবে কও তুমি জেঠা আমারে শান্ত অইতে! স্বামীদের সামনে স্ত্রী এরকমভাবে অপমানিত হইচ্ছে, আর অথর্ব স্বামীরা তাকাইয়া তাকাইয়া দেইখছে সে দৃশ্য! ধিক তোমাদের জেঠা, ধিক পুরুষদের।'

'তোমার কথা মানি কুন্তী। কিন্তু ধর্মের কথাও তো তুমি মাইনবে!' মৃদু স্বরে বলে অজয় জেঠা।

'ধর্মের কথা! কীসের ধর্মের কথা? স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার আছে। অধিকার আছে বইলে স্বামী স্ত্রীকে যা ইচ্ছা তা-ই কইরতে পারে—এই তো বইলতে চাইতাছ তুমি! আমি মানি না সেই ধর্মকথাকে।' কুন্তী আকুল হয়ে বলে।

এই সময় শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে—সত্যিই তো! স্ত্রী বলে কি তাঁর কোনো অস্তিত্ব নেই! স্বামীর অন্যায় ইচ্ছেয় সায় দিতে হবে নাকি দ্রৌপদীকে?

অনীল সরকার বলে উঠল, 'কুন্তী ঠিকই বইলেছে জেঠা। যুধিষ্ঠির বড় অন্যায় কইরেছেন দ্রৌপদীর উপর।'

'বস্ত্রহরণে যদি দ্রৌপদী লজ্জা পায়, নারীকুল যদি অপমানিত অয়—তবে তার সকল দায় ওই যুধিষ্ঠিরের, ওই পুরুষজাতির উপর বর্তায় সমস্ত দায়। এই আমার শেষ কথা।' শ্লেষ মেশানো গলায় বলে উঠল কুন্তী।

অপ্রস্তুত হয়ে অজয় মণ্ডল সবার দিকে তাকিয়ে থাকল। তার কিছু বলতে ইচ্ছে করল না। কী বলবে অজয় মণ্ডল? এতজন সভাষদ, যেখানে ভীষ্ম-ধৃতরাষ্ট্রের মতন মানুষেরা উপস্থিত আছেন, উপস্থিত আছেন দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী, তাঁদের সামনে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করা হচ্ছে, একজন পুরুষও জ্বলে উঠলেন না! জনসমক্ষে একজন রাজবধূর এতবড় অপমানে কেউ প্রতিবাদ করলেন না! কেউ তাকিয়ে থাকলেন, কেউ-বা থাকলেন অধোবদনে! ওই কুরুসভায় প্রকৃতপক্ষে নারীজাতির অপমান হয়নি, হয়েছে তো পুরুষজাতির! দ্রৌপদীর নগ্ন বক্ষ, উদোম শরীর দেখার ইচ্ছে কি তাহলে সকল সভাজনের মনে জেগেছিল? নইলে নির্বাক থাকলেন কেন সকলে? কুন্তী সত্যি বলেছে—দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সকল দায় পুরুষজাতির।

সেরাতে আর 'মহাভারত'পাঠ জমল না। শান্তনুও পড়তে উৎসাহ হারাল। অজয় মণ্ডলের ব্যাখ্যা কেন জানি নিষ্প্রভ হয়ে গেল সেরাতে।

আস্তে আস্তে সবাই উঠে গেল আসর থেকে।

পাঁচ

অজয় মণ্ডলের বড় উঠান। ওই উঠানে মিটিং-এর আয়োজন করা হয়েছে। প্রধান বক্তা আবুল কাশেম। তার চারদিকে সাঙ্গাতরা। সামনে বিছানো চাটাইয়ে মালোরা বসা। মালোরা যে ইচ্ছে করে এই মিটিং-এ এসেছে, এমন নয়। যারা আসতে চায়নি, তাদের ওপর জোর খাটানো হয়েছে। এক পাশে নারীরা আরেক পাশে পুরুষেরা বসেছে।

আবুল কাশেম বলছে, 'দ্যাখ মালোর পুতরা, সামনে ইলেকশন। ইলেকশন মাইনে নির্বাচন। জাতীয় নির্বাচন। তোমাদের দলও দাঁড়াইছে।

আমাদের পার্টির লোকও খাড়াইছে। স্বাধীনতার পর থেইকে বহুত ভোট দিছ ওই ভারতমার্কা দলরে। এইবার ভোট দিবা আমাদের পার্টির কেন্ডিডেটরে। বুঝছ?'

সমবেত মালোরা চুপচাপ থাকে। চোরা চোখে একজন অন্যজনের দিকে তাকায়।

ফখরে আলম বলে ওঠে, 'কীরে বেটারা, কিছু বইলছ না ক্যান? হুজুরে কী বইলেছেন শুইনতে পাও নাই? কী অজয় মণ্ডল, কিছু বলো।'

'কী আর বইলবো হুজুর!' কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে অজয় জেঠা বলে।

'কী বইলবে মাইনে! কাকে ভোট দিবা সে কথা বইলবে!' ফখরে আলমের পাশে দাঁড়ানো শহীদুল বলে ওঠে।

'আহ শহীদুইল্যা, মাথা গরম করস ক্যান? ওদের ভাইবতে দে। তা অনেকক্ষণ তো ভাইবলে, এবার কও আমার প্রস্তাবে রাজি আছ কি না তোমরা?' আবুল কাশেম মাথা ঠান্ডা রেখে কথাগুলো বলে গেল।

কুন্তী দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে ডান হাত ছড়িয়ে বলল, 'আপনার প্রস্তাবে আমরা রাজি না। কারে ভোট দিব তা আমরা ঠিক কইরবো। কারে ভোট দিব, তা নির্ধারণ কইরে দেওয়ার আপনি কে?'

'কে জানস না মাগি? চেয়ারম্যান সাহেব! তোর বাবা। তেরিমেরি করস ক্যান? তেল অইছে গায়ে! তেল চেঁছে নিব শরীর থেইকে।' মাথাগরম শহীদুল গর্জে উঠল।

ফখরে আলম শহীদুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চড় দিতে দিতে বলল, 'হারামজাদা, মুখে টাট্টিখানা বসানো তোর? খারাপ কথা বলস হারামির পুত?'

আবুল কাশেম নরম সুরে বলে, 'বড় অন্যায় কইরে ফেইলেছে শহীদুল। ওরে মাফ কইরে দেও তোমরা। আর হ্যাঁ, যা বইলেছি, তার ব্যতিক্রম যাতে না হয়। মনে রাইখ আমার কথা। মিটিং এখানে শ্যাষ। আগামী পরশু ভোট। ব্যতিক্রম কইরবে না মালোর পুতরা।' কুন্তীর ওপর কড়া চোখ রেখে কথা শেষ করে আবুল কাশেম।

পথে যেতে যেতে আবুল কাশেম ফখরে আলমকে চাপা স্বরে বলল, 'আমাদের কেন্ডিডেট যদি হারে তাইলে ওই মাগির জইন্য হাইরবে। মালোদের ভোট ছাড়া জেতার উপায় নাই। বড় বাড় বেইড়ে গেছে রে কুন্তীর! দেমাক ভাঙার বেবস্থা কর।'

ছয়

সেরাতে অজয় মণ্ডলের দাস্ত হলো। দাস্তের সঙ্গে ভেদবমি। শেষরাতে মারা গেল অজয় জেঠা। পাড়া ভেঙে মানুষ জড়ো হলো অজয় জেঠার উঠানে।

অজয় জেঠাকে শ্মশানে নিয়ে আসা হয়েছে। ভৈরব নদের জলে স্নান করানো হয়েছে তাকে। সবাই শোকার্ত। চাঁপাতলার মালোপাড়ার একজনও আজ ঘরে বসে নেই। আতুর রাধারানি, সেও এসেছে ছেঁচড়িয়ে ছেঁচড়িয়ে।

চিতায় তোলা হয়েছে অজয় জেঠার মরদেহ। চিতার চারদিকে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়েছে মালোরা। ব্রাহ্মণ তার প্রস্তুতিকার্য নিষ্পন্ন করছে। অশ্রুসিক্ত চোখে কুন্তী ব্রাহ্মণকে সাহায্য করছে। প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে মুখাগ্নি করা হবে অজয় জেঠার। শান্তনুই জেঠার মুখাগ্নি করবে। শান্তনুর চেয়ে আপনজন আর কে ছিল জেঠার!

এই সময় হই হই করে শ্মশানে ঢুকে পড়ল আবুল কাশেম চেয়ারম্যান। সঙ্গে দলবল।

আবুল কাশেম চিৎকার করে বলল, 'তোদের তো সাহস কম না মালাউনের বাইচ্চারা! নিষেধ করা সত্ত্বেও মড়া লইয়া এইসেছিস এখানে? তোদের বলি নাই, এই জায়গা আমার? বন্ধ কর এইসব।'

'বন্ধ কইরবো না। এইটা আমাদের জায়গা, আমাদের শ্মশান। এইখানেই অজয় জেঠাকে পোড়ানো অইবে। দেখি কী কইরতে পারেন!' চিৎকার করে বলল কুন্তী।

আবুল কাশেম মাথার টুপি খুলে বলল, 'বেশি বাড় বাইড়ো না বেটি। ভালা অইবে না কিন্তু।'

'কী ভালা অইবে না, হ্যাঁ? কী ভালা অইবে না?' চেয়ারম্যানের দিকে দু'কদম এগিয়ে কুন্তী তর্জনী নাড়িয়ে বলল।

আবুল কাশেম হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠল, 'ফখরে আলম রে—!'

আবুল কাশেমের দল মালোদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এত কিরিচ, এত লাঠিসোঁটা কোথায় ছিল কে জানে! সবার হাতে হাতে লাঠিসোঁটা আর কিরিচ।

কিছু মালো পালিয়ে বাঁচল, কিছু মাটিতে লুটিয়ে কঁকাতে লাগল। দাঁড়িয়ে থাকল শুধু কুন্তী।

আবুল কাশেম বলল, 'ফখরে, দ্যাখ কিছু কইরতে পারিস কিনা।'

ফখরে কাছে গেলে কুন্তী দূরে সরে যেতে চাইল। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারল না। শহীদুল এসে জুটল ফখরে আলমের সঙ্গে। শহীদুল একটানে কুন্তীর শাড়ি খুলে ফেলল।

কুন্তীর পরনে শুধু পেটিকোট আর ব্লাউজ। কুন্তীর নিতম্বে হাত দিল শহীদুল।

এইসময় কোত্থেকে লাঠি হাতে দৌড়ে এলো শান্তনু। ফখরে আলম এক বাড়িতে শুইয়ে দিল শান্তনুকে।

শহীদুল ততক্ষণে কুন্তীর পেটিকোটের ফিতে ধরে টান দিয়েছে।

গিঁট খুলে গেছে। কুন্তীর পেটিকোট খুলে নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে।

কুন্তী চোখ বন্ধ করল।

তার গলা চিরে বেরিয়ে এলো, 'ভগবান রে...।'

শ্মশানের পাশ দিয়ে বহমান ভৈরব নদে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুন্তী।

কুন্তীর পেটিকোট সামনে নিয়ে হা হা করে হেসে উঠল আবুল কাশেম।

উপেক্ষিতা

'আমি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে যাচ্ছি সরমা।' বলল বিভীষণ।

'রাজপ্রাসাদ ছেড়ে যাচ্ছ!'

'হ্যাঁ।'

'কেন! কেন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে যাচ্ছ তুমি!' সরমা বলল।

'এত বড় অপমানের পরও এই রাজভবনে থাকতে বলো তুমি আমায়!'

'দাদা রাবণ তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর, না হয় তিনি তোমার ভর্ৎসনা করেছেন!'

'এটাকে ভর্ৎসনা বলো তুমি! লাথি মারাকে তিরস্কার বলো!' জ্বলে-উঠা কণ্ঠ বিভীষণের।

'তোমার দাদা তিনি। এই মুহূর্তে গভীর উচাটন তাঁর। অস্থিরতার মধ্যে কাজটি করে ফেলেছেন।'

'তাই বলে জনসমক্ষে! প্রকাশ্য রাজসভায়! এতজন সভাষদের সামনে!'

'মাথা ঠান্ডা কর তুমি, ধৈর্য ধর।' বলে সরমা।

'এরকম মর্মান্তিক অপদস্থতার পরও স্থির থাকতে বলছ তুমি আমায়? আমার কি পৌরষ নেই! আমি কি এই রাজপরিবারের কেউ নই!'

'হ্যাঁ, তুমিও তো এই স্বর্ণলঙ্কার রাজপুত্র। দাদা কুম্ভকর্ণ বয়সে তোমার বড় বটে, কিন্তু বড়দার কাছে তোমার গুরুত্ব কুম্ভকর্ণের অধিক।'

'সেই গুরুত্বের কী নিদারুণ মর্যাদা পেলাম আজ! হাঃ!' বেদনা ঝলকে উঠল বিভীষণের কণ্ঠে।

'লঙ্কাধিপতির এরকম দুর্ব্যবহারের কথা শুনে আমারও কম খারাপ লেগেছে বলো! অপমানে মরে যেতে ইচ্ছে করেছে তখন আমার।' বলল সরমা।

'সেই অপমান, আমাকে রাজসভায় লাঞ্ছিত করবার সেই ঘটনাটি যদি তোমাকে মর্মাহতই করে, তাহলে রাজবাড়ি ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন? কেন তুমিও আমার সঙ্গে এই কলঙ্কপুরী ত্যাগ করছ না?' সরোষে বলল বিভীষণ।

'আমার যে হাত-পা বাঁধা আর্যপুত্র!' স্বামী বিভীষণের উদ্দেশে করুণ কণ্ঠে বলল সরমা।

'দুটো কারণে হাত-পা বাঁধা আমার।' আবার বলল সরমা।

বিভীষণ বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'দুটো কারণে হাত-পা বাঁধা!'

'হ্যাঁ দুটো কারণে এই স্বর্ণলঙ্কা ত্যাগ করে যেতে পারি না আমি। তার প্রথমটি রামপত্নী সীতা, আর দ্বিতীয় কারণ দেশপ্রেম। শেষেরটা তোমার মধ্যে নেই।' বলল সরমা।

'নেই! নেই মানে কী! আমি কি আমার জন্মভূমি লঙ্কাকে ভালোবাসি না?' চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করে বিভীষণ।

সরমা প্রসঙ্গ এড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

একটু থতমত খেল বিভীষণ। আমতা আমতা করে বলল, 'দেখি, কোথায় যাওয়া যায়!'

'ইতস্ততার ভঙ্গি করে সত্যকে ঢাকছ তুমি।' স্পষ্ট গলায় বলল সরমা।

'সত্যকে ঢাকছি!'

'তাই তো। নইলে সত্য বলতে তোমার এত দ্বিধা কেন?'

'রামশিবিরে যোগদান করতে।' এবার ঢাক ঢাক গুড়গুড়ে গেল না বিভীষণ।

নিরাবেগ গলায় সরমা জিজ্ঞেস করল, 'রাম কে?'

'রাম কে মানে! রাম কে তুমি জান না! দাদা রাবণ যে-সীতাকে অপহরণ করে এনেছে, সেই সীতার স্বামী রাম!'

'জানি।'

'তাহলে আবার জিজ্ঞেস করছ—রাম কে!'

'রাম শুধু সীতা উদ্ধারকারী নয়, একজন আক্রমণকারীও। তার হাতে যদি লঙ্কার পতন হয়, এই দেশের কী হবে ভেবেছ?'

'রাবণের মৃত্যু হবে।'

'শুধু লঙ্কাধিপতির মৃত্যুটাই দেখলে, লঙ্কার স্বাধীনতাটা দেখলে না! আর্যদের পায়ের নিচে এই অনার্যরাজ্যটি পিষ্ট হতে থাকবে, সেটা ভাবলে না! লঙ্কা যে অযোধ্যার একটা করদরাজ্যে রূপান্তরিত হবে, সেটা বুঝছ না!'

মাথা নিচু করে থাকে বিভীষণ।

সরমা আবার বলে, 'তোমার মধ্যে আর যা-ই থাকুক, দেশপ্রেম নেই। আর দেশশত্রুরাই অরিদলে যোগদান করে।'

'এসব কী বলছ তুমি! তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমি তোমার স্বামী!'

'তুমি একজন বিশ্বাসঘাতক। স্বার্থপর তুমি।'

'আর তুমি এমন কি বিশ্বাসরক্ষক হয়েছ যে, রাবণের পরনারীহরণকে সমর্থন করছ!'

'দাদার এই কুকীর্তিকে কিছুতেই সমর্থন করি না আমি। তাই বলে বিশ্বাসঘাতক হব কেন? শত্রুদলে যোগ দেব কেন? দেশ তো আমার মায়ের সমান। স্বর্গের বাড়া। এই স্বর্গকে পররাজ্যলোভী রামের হাতে তুলে দেব কেন?'

সরমার কথা শুনে ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায় বিভীষণ। নিজেকে সংহত করে। বলে, 'আর যে সীতার কথা বললে! দেশপ্রেমের কথা বুঝলাম, কিন্তু সীতার জন্য রাজপ্রাসাদ ছাড়বে না, বুঝলাম না তো!'

'সেটা তোমার না-বোঝার মধ্যেই থাকুক। তোমার দৃষ্টিশক্তি যদি তীক্ষ্ণ হতো, তাহলে এই প্রশ্নটি করতে না। যাক সেকথা। তোমাকে একটা অনুরোধ করব, বড় দাদাকে ত্যাগ করে যেয়ো না। তুমি রাজনীতি-অভিজ্ঞ মানুষ। এই সংকটে তোমাকে বড় প্রয়োজন দাদা রাবণের। দাদা বাহুবলী, কিন্তু মেধাহীন। তোমার কৌশলী পরামর্শে দাদা এই যুদ্ধে অবশ্যই জিতে যাবেন।'

'তোমার কথা রাখতে পারব না আমি। আমাকে যেতেই হবে। রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার জন্য জরুরি।'

'কেন যাচ্ছ?'

'রাবণের পদাঘাত করার শোধ নিতে।'

'আমি বিশ্বাস করি না। তুমি শত্রুশিবিরে যোগদান করছ রাবণের মৃত্যু ঘটিয়ে এই স্বর্ণলঙ্কার রাজা হতে। ধিক তোমাকে!'

'তুমি যতই আমাকে ধিক্কার দাও, তোমায় ভালোবাসি আমি সরমা। আজীবন ভালোবেসে যাব তোমায়।' বলল বিভীষণ।

চোখে তীব্র জ্বালা ছড়িয়ে সরমা বলল, 'বিশ্বাসঘাতকের আবার ভালোবাসা!'

সেদিন স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা করেনি বিভীষণ। গোপনপথে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

রাম-লক্ষ্মণ তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

অপার বিস্ময় আর বিপুল অস্থিরতা নিয়ে সরমা রাজপ্রাসাদে ছটফট করছিল। তার একদিকে স্বামীপ্রেম, অন্যদিকে দেশপ্রেম। স্বামীপ্রেমকে হেলায় ঠেলে দেশপ্রেমকে বুকের নিচে জাগিয়ে রেখেছিল।

বিশ্রবা আর নিকষা স্বামী-স্ত্রী। কালে কালে এদের সন্তান হলো—তিনপুত্র, এক কন্যা। পুত্রদের নাম—রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ। আর শূর্পনখা হলো কন্যার নাম।

কালক্রমে রাবণ লঙ্কার রাজা হলো। মাটির লঙ্কাকে স্বর্ণলঙ্কায় রূপান্তরিত করল রাবণ। রাজপ্রাসাদকে স্বর্ণ দিয়ে মোড়াল। রাবণ শক্তিতে মত্ত।

কুম্ভকর্ণ রাজনীতির কূটচালে থাকে না। রাবণ তার কাছে দেবতার মতন।

বিভীষণ বিচক্ষণ। বুদ্ধিতে ক্ষুরধার সে। ছোটবেলা থেকেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। রাবণ-কুম্ভকর্ণ আজকে দেখে, বিভীষণ দেখে আগামীকালকে বা তারও পরের পরের ভবিষ্যতকে।

বিয়ের বয়স হলে মা নিকষা বিভীষণের বিয়ের উদ্যোগ নেয়। তার আগে বড় এবং মেজ পুত্রের বিয়ে সম্পন্ন করেছে নিকষা। মন্দোদরীকে নিজে নির্বাচন করেছে রাবণ, নিকষার নির্বাচনে কুম্ভকর্ণের বিয়ে হয়েছে।

বিয়ের প্রসঙ্গে বিভীষণ মাকে শুধু বলেছে, 'মা, তোমার পুত্রবধূকে সুন্দরী এবং নরম স্বভাবের হতে হবে।'

সরমার সঙ্গেই বিয়ে হলো বিভীষণের। সরমা শান্ত, নম্রস্বভাবা, সুন্দরী এবং স্নিগ্ধা।

গন্ধর্বকন্যা সরমা। বাবা ব্রাহ্মণ, মা অনার্যা। গান্ধার দেশের রাজা শৈলূষের প্রাসাদে বড় হতে থাকে সরমা। ফুল্ল-কুসুম যেন সরমা! মায়াময় চোখ, লাবণ্যেভরা দেহ। মনটা দয়ার্দ্র।

মায়ের আদেশে রাবণ বিভীষণের জন্য পাত্রীর সন্ধানে বেরিয়েছে। এদেশ-ওদেশ ঘুরতে ঘুরতে একদিন গান্ধার দেশে উপস্থিত হলো রাবণ। সরমাকে দেখে রাবণ বড় মুগ্ধ হলো। এরকম শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্মমনস্ক, মানবিক কন্যাই তো দরকার বিভীষণের জন্য! বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন গান্ধাররাজ শৈলূষ। মহাসমারোপে বিভীষণ আর সরমাতে বিয়েটা হয়ে গেল।

দিন চলল আপন ছন্দে। বিভীষণে এবং সরমাতে ভালোবাসাবাসির অন্ত নেই। সরমা একমুহূর্ত চোখের আড়াল হলে বিভীষণের উচাটন। বছরাধিককাল অতিবাহিত হলো। সন্তান এলো তাদের ঘরে। প্রথমে তরণীসেন, পরে কলা। তরণীসেন পুত্র, কলা কন্যা। সরমা-বিভীষণের জীবনে সুখ উছলে উঠল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসাবাসি আরও গভীর হলো।

তারপর হঠাৎ সেই ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটল।

রাবণ দোর্দণ্ডপ্রতাপী। তার অনেক গুণ। প্রজাহিতৈষী, দেশপ্রেমিক, বীর, দানশীল, সৌন্দর্যানুরাগী। প্রত্যেক গুণশালী মানুষের চরিত্রে একটা হীনতা থাকে। রাবণের চরিত্রেও সেই হীনতা আছে। রাবণ নারীলোলুপ।

শূর্পনখা পুরুষলোভী। পঞ্চবটী বনে রামকে দেখে সঙ্গসুখের লোভ জাগল শূর্পনখার মনে। রাম দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা এবং লক্ষ্মণ দ্বারা লাঞ্ছিতা শূর্পনখা রাবণকে সীতার সন্ধান দিল। সীতা অপার রূপসী। এরকম রূপে-লাবণ্যেভরা নারী রাবণপ্রাসাদে নেই। রাবণ বোনের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সঙ্গে যুক্ত হলো রমণেচ্ছা। পরনারী রমণেতে যে স্বর্গসুখ!

রামের পিতা দশরথের রাজ্য লঙ্কা থেকে বহু বহু যোজন দূরে, অযোধ্যা ছেড়ে রাম-লক্ষ্মসীতার গহিন অরণ্য পঞ্চবটীতে আসার কথা নয়। এসেছিলেন চৌদ্দ বছরের বনবাসে, পিতৃসত্য রক্ষা করবার জন্য। রাম-সীতার পর্ণকুটিরে বসবাস, লক্ষ্মণ ওঁদের নিরাপত্তা-প্রহরী। ইতোমধ্যে তের বছর নয় মাস অতিবাহিত। চৌদ্দ বছর পূর্ণ হওয়ার মাত্র তিনমাস আগে রাবণ সীতাকে হরণ করে বসল।

অপহরণের প্রথম রাত রাবণ সীতাকে রাজপ্রাসাদে রাখল। অন্যরা তো দূরের কথা, সেই রাতে স্ত্রী মন্দোদরীর কাছ থেকেও প্রাসাদে অবস্থান করার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল রাবণ। পরদিন সীতা নিক্ষিপ্ত হলেন প্রাসাদ-সংলগ্ন অশোকবনে। ভয়ংকরদর্শন চেড়িরা সীতার প্রহরায় থাকল। চেড়িরা দুরাচারী, তাদের মুখে সর্বদা কটুভাষ। অন্য কারও প্রবেশাধিকার নেই সেই অশোকবনে। অনেক অনুনয়ের পর রাবণের কাছ থেকে সীতাসঙ্গের অধিকার পেয়েছে সরমা। সরমা বড় বোনের মতো সীতাকে সঙ্গ দেয়, অভয় দেয়। সরমার কাছ থেকে রাম-রাবণের সম্ভাব্য যুদ্ধের কথা অবগত হন সীতা।

সীতাহরণের পর লঙ্কার রাজপ্রাসাদ দ্বিধা বিভক্ত। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, অমাত্যসকল, বীরযোদ্ধারা, বীরবাহু, মেঘনাদ, শূর্পনখা সীতাহরণের পক্ষে। তারা সাধারণ জনমানুষকে বোঝাল—রাম পররাজ্যলোভী। আর্যশাসন অনার্যশাসিত লঙ্কা পর্যন্ত বিস্তৃত করতে বানরসেনা নিয়ে লঙ্কা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে রাম। সীতাহরণের ব্যাপারটি কৃত্রিম একটা উপলক্ষমাত্র। কিষ্কিন্ধ্যার বানররাজ সুগ্রীম বিশ্বাসঘাতক। নিজে অনার্য হয়েও সাদা চামড়ার আর্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

রাজা এবং রাজন্যদের ভাষণে লঙ্কার সাধারণ মানুষেরা রাবণের পক্ষ নিল।

কিন্তু সীতাহরণের বিপক্ষে তিনজন—মন্দোদরী, সরমা এবং বিভীষণ। প্রধান মহিষী মন্দোদরীর কেন জানি মনে হচ্ছে—সীতাহরণ তার জীবনে শনি ডেকে এনেছে। সীতাহরণের পর থেকে রাজা রাবণ কেন জানি তার প্রতি অনাগ্রহী হয়ে উঠেছে।

বিভীষণেরও মনে হচ্ছে, দাদার এই ভুলটির জন্য স্বর্ণলঙ্কা ছারখার হয়ে যাবে। লঙ্কার সকল সুখ-স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্য তিরোহিত হবে। তাছাড়া একজনের স্ত্রীকে তার অসম্মতিতে গায়ের জোরে উঠিয়ে নিয়ে আসা! এ কেমন কথা! রাজা হয়ে রাবণের একী সিদ্ধান্ত! না না, এ বড়ো অন্যায়, এ বড়ো অবাচীর্নতা। দাদার এই হঠকারী কাজের প্রতিবাদ জানানো দরকার।

বিভীষণপত্নী সরমারও মনে হয়েছে—লঙ্কাধিপতি মস্তবড় অনীতি করেছেন, সীতাকে পঞ্চবটীবন থেকে হরণ করে এনে। সরমার প্রতিবাদ ওই ভাবনা পর্যন্ত। রাবণের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর সাহস নেই সরমার।

কিন্তু বিভীষণ সাহস করে দাদার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'সীতাকে হরণ করে আনা আপনার একেবারেই উচিত হয়নি দাদা। সীতা অন্য একজনের স্ত্রী। পরস্ত্রীহরণে মহাপাপ। শুধু মহাপাপ নয়, জগৎজুড়ে মহাকলঙ্কও রটে যাবে।'

রাবণ ক্রোধান্বিত হলো। প্রচণ্ড পদাঘাতে চিত করে ফেলে দিল বিভীষণকে। রাজসভাতেই ঘটল ঘটনাটা।

অনন্ত অপমানে ডুবে গেল বিভীষণ। অপমান থেকে ক্রোধ জাগল। ক্রোধান্বিত বিভীষণ সিদ্ধান্ত নিল—রাজপ্রাসাদ ছেড়ে যাবে, রামের দলে যোগদান করবে, রাবণ-ধ্বংসের সকলরকম মন্ত্রণা দেবে রামপক্ষকে।

যাওয়ার আগে সরমার সঙ্গে দেখা করা জরুরি।

দেখা হলো দুজনের। কথাও হলো। দুজনেই সীতাহরণের বিপক্ষে। তারপরও বিভীষণের রামশিবিরে যোগদান করা চরম বিশ্বাসঘাতকতা। সেই কথাই স্বামীকে বলল সরমা।

বলল, 'আমি দাদার এই দুষ্কর্মের বিরোধী। সীতাকে আমি ভালোবাসি। সীতা এই কারাগার থেকে মুক্তি পাক, তাও চাই। কিন্তু এটা কিছুতেই চাই না, এই মুক্তি হবে লঙ্কার স্বাধীনতার বিনিময়ে! তুমি ভাবলে কী করে, রামদলে যোগ দেবে তুমি! কী স্বার্থ তোমার! ধর্মবোধ! আমি নিশ্চিত,

ধর্মবোধের তাড়নায় তুমি দাদা রাবণকে ত্যাগ করে যাচ্ছ না। তোমার এ যাত্রায় অন্য কোনো অভিসন্ধি আছে।' অনেকক্ষণ কথা বলে হাঁপিয়ে উঠল সরমা।

বিভীষণ ত্বরিত বলে উঠল, 'অভিসন্ধি!' বলবার সময় বিভীষণের গলাটা কেন যেন একটু কেঁপে উঠল!

টের পেল সরমা। বলল, 'তোমার লক্ষ্য অন্যকিছু।'

'অন্যকিছু!' ধরাপড়া কণ্ঠ বিভীষণের।

'তা-ই মনে হচ্ছে আমার।' একটু থামল সরমা। খাঁকারি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিল।

আবার বলল, 'তোমার লক্ষ্য লঙ্কার রাজসিংহাসন, তোমার লক্ষ্য ...।' কথা শেষ না করে থেমে গেল সরমা।

বিভীষণ বলে উঠল, 'থামলে কেন, বলো বলো, আর কী বলতে চাইছ!'

'না থাক। ভবিষ্যত বলবে, তোমার দ্বিতীয় লক্ষ্য কী।' ম্লান কণ্ঠে সরমা বলল।

'ভবিষ্যতের কথা বলছ কেন? এখনই বলো—আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটা কী?' উষ্ণ গলায় বলল বিভীষণ।

সরমা নিষ্ঠুর নির্মোহ কণ্ঠে বলল, 'প্রধান মহিষী মন্দোদরীকে শয্যাসঙ্গিনী করা।'

একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেল বিভীষণ। অনেক চেষ্টাতেও তার মুখ থেকে রা বেরোল না। অনেকক্ষণ পর নিজেকে সংযত করে বিভীষণ বলল, 'এ তোমার উর্বর মস্তিকের উদ্ভট কল্পনা সরমা। বউদি মায়ের সমান। মন্দোদরী আমার সম্মানীয়। রাজমহিষী তিনি। তিনি রূপময়ী, কিন্তু দুর্মূল্য।'

বাঁকা একটু হাসি সরমার ঠোঁটে ঝিলিক দিয়ে উঠল। নীরব রইল সে। যা বলার তা আগেই বলে ফেলেছে সরমা।

নিরুপায় বিভীষণ বলল, 'আমি তোমায় ভালোবাসি সরমা।'

সরমা বলে উঠেছিল, 'বিশ্বাসঘাতকের আবার ভালোবাসা!'

সীতার কাছে ফিরে গিয়েছিল সরমা।

আর বিভীষণ গিয়েছিল রামশিবিরে।

সরমা সীতাকে বলেছিল, 'তোমার মুক্তির দিন আসন্ন সীতা।'

করুণমুখে সীতা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী করে বুঝলে?'

সরমা বলল, 'শতসহস্র বছর যুদ্ধ করেও রাম তোমাকে উদ্ধার করতে পারত না।'

'এখন পারবে কী করে!'

'রাজা রাবণের ভাই বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ রামদলে যোগদান করেছে।'

'তো—!' অবাক সীতা।

সরমা বলল, 'রাবণনিধনের অন্ধিসন্ধি বিভীষণের ভালো করেই জানা।'

সীতা নিশ্চুপ থাকে।

সরমা গলা ছেড়ে কেঁদে ওঠে।

রাম আর রাবণে ঘোর যুদ্ধ হয়।

রামের পক্ষে বানরবাহিনী, রাবণের পক্ষে রাক্ষসসৈন্য।

রাবণের একলক্ষ পুত্র আর সোয়ালক্ষ নাতি নিহত হলো এই যুদ্ধে। রাবণপুত্র মেঘনাদকে বিভীষণের প্ররোচনায় হত্যা করা হলো। যুদ্ধে নিহত হলো সরমাপুত্র তরণীসেন। এমন শক্তিমান যে কুম্ভকর্ণ, একদিন সেও হত হলো। শেষ পর্যন্ত লঙ্কাধিপতি রাবণ পরাজিত ও নিহত হলো।

সীতা উদ্ধার হলো।

হাজার লক্ষ আত্মীয়, শত সহস্র স্বজাতিসৈন্যের রক্ত মাড়িয়ে বিভীষণ লঙ্কায় প্রবেশ করল।

রাম বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে অভিষিক্ত করলেন।

রাবণপত্নী মন্দোদরীকে বিয়ে করে প্রধান মহিষী বানাল বিভীষণ।

উপেক্ষিতা সরমা বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেল। বিভীষণের জৌলুসময় জীবন থেকে অনেক দূরে সরে গেল সে।

সীতা-পরিত্যক্ত সেই অশোকবনে আশ্রয় নিয়েছে সরমা। জীর্ণ দেহ, শীর্ণ মুখ এখন তার।

মাঝে মাঝে সরমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, 'বিশ্বাসহন্তা!'

বিভীষণের প্রতি সরমার এই কথা কেন?

লঙ্কার স্বাধীনতাহরণে রামকে সহায়তা করেছে বলে? না সরমার প্রতি অবহেলা দেখিয়ে মন্দোদরীকে বিয়ে করেছে বলে?

ব্যর্থ কাম

খুব 'মহাভারত' পড়েন ধরণীবাবু।

আগে পড়তেন কাহিনির টানে, এখন পড়েন জীবনের অন্তর্গূঢ় রহস্যের উত্তর খোঁজার বাসনায়।

ধরণীবাবুর পুরো নাম ধরণীপ্রসাদ চক্রবর্তী। এখন তেষট্টি। চাকরি করতেন একটা বেসরকারি ব্যাংকে, অ্যাকাউন্টস সেকশনের প্রধান ছিলেন। পঞ্চান্নতে চাকরি ছাড়েন। মানে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন। হিসেবের গোলমালের কারণে সাসপেন্ড হবার আগেই চাকরি থেকে অব্যাহতি নেন চক্রবর্তীবাবু।

অব্যাহতি নেওয়ার আগে সেলিম সাহেবকে ফাঁসিয়ে যান। সেলিম জাহিদকে দীর্ঘ চার বছর ব্যাংকের টাকা আত্মসাতের অপরাধে জেল খাটতে হয়েছে। সেলিম জাহিদ ধরণীবাবুর অধস্তন কর্মকর্তা ছিলেন না। ছিলেন ওই ব্যাংকের ম্যানেজার। তারপরও চক্রবর্তীবাবুর মারপ্যাঁচে কুপোকাত হয়েছিলেন সেলিম জাহিদ। জাহিদ সাহেব জেলে গেলে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক নিয়েছিলেন ধরণীবাবু। তদন্ত কমিটি সন্দেহের তর্জনী তাঁর দিকেও উঁচিয়ে ছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে জাহিদ সাহেব শাস্তি পেলেও ধরণীবাবু জানতেন, তাড়াতাড়ি বিদায় না নিলে অধিকতর তদন্তে, যদি হয় কখনও, তাঁকেও ফেঁসে যেতে হবে। জাহিদ সাহেবের সইটা তো তিনিই জাল করিয়েছিলেন।

নন্দনকানন গোলাপ সিংহ লেনে বাড়ি তাঁর। চাকরি থাকতে থাকতেই বাড়ির ফাউন্ডেশনটা দিয়েছিলেন, চাকরি ছাড়ার পর কমপ্লিট করেছেন। টাইলস মোড়ানো ঝকঝকে আলিশান তেতলা বাড়ি। প্রতিবেশী আর পরিচিতরা চোখ ঠাটিয়েছিল। এতটাকা পেলেন কোথায় ধরণীবাবু! চাকরি থাকলে না হয় একটা কথা ছিল! বউও তো কোনো চাকরিবাকরি করেন না, গুপ্তধন পেয়েছেন নাকি?

গুপ্তধন পেয়েছিলেন বইকি ধরণীবাবু!

ম্যানেজার সেলিম জাহিদ সহজ সরল মানুষ ছিলেন। ধরণীবাবুকে বড় বিশ্বাস করতেন তিনি! আর তাঁর সইটাও ছিল সোজা, ব্যাংকের চেকে,

কাগজপত্রে 'সে জাহিদ' লিখতেন শুধু। সাধারণত উর্ধ্বতন পদের কর্মকর্তারা নিজেদের সই-স্বাক্ষর প্যাঁচালো করেন। অন্যরা যাতে স্বাক্ষর জাল করতে না পারে। সেলিম সাহেব তা করেননি।

প্রথম দিকে ধরণীবাবু একবার বলেছিলেন, 'একটা কথা বলি স্যার, আপনার স্বাক্ষরটা বড়ই সোজা। যেকোনো সময় বিপদে পড়তে পারেন।'

সন্দিগ্ধ চোখে সেলিম জাহিদ ধরণীবাবুর দিকে তাকিয়ে থেকেছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর ফিক করে হেসে দিয়েছিলেন। ফিক করে মেয়েরা হাসে, পুরুষেরা নয়। সেলিম সাহেব ফিক করে হেসেছিলেন। কারণ তাঁর মধ্যে মেয়েলিভাবটা একটু বেশি। মেয়েদের মতো বোকাসোকাও ছিলেন তিনি। নইলে কেন ধরণীবাবুর আগাম সতর্কবাণী থেকে কোনো শিক্ষা নেননি? ধরণীবাবুর কথা থেকে তিনি যদি শিক্ষা নিতেন, স্বাক্ষরটা যদি জটিল করতেন, তাহলে তাঁকে জেলও খাটতে হতো না আর ধরণীবাবুর অর্থনৈতিক অবস্থা এরকম বিস্ময়করভাবে পরিবর্তিতও হতো না।

সেদিন ধরণীবাবুর কথা শুনে সেলিম জাহিদ হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'অ্যাকাউন্টেন্ট-ক্যাশিয়ারের কারণেই ম্যানেজাররা বিপদে পড়ে, হিসাবশাখার প্রধান অসৎ হলে ম্যানেজারের বারোটা বাজে। আপনি একজন সৎলোক ধরণীবাবু। আপনি থাকতে আমি বিপদে পড়ব কেন?'

সেদিন আর কথা বাড়াননি ধরণীবাবু। 'তা তো বটেই, তা তো বটেই, বলতে বলতে সেলিম জাহিদের সামনে থেকে উঠে গিয়েছিলেন।

আনোয়ারার তৈলারদ্বীপ গ্রাম থেকে খালি হাতেই চট্টগ্রাম শহরে এসেছিলেন ধরণীবাবু। সম্বল শুধু বিকম পাসের সার্টিফিকেটটা আর 'চক্রবর্তী' পদবিটা। বাপ নিখিল চক্রবর্তী ছিলেন পূজারি বামুন। এ-বাড়ি ও-বাড়ি, এ-মন্দির ও-মন্দিরে পুজো-আচ্চা করে সংসার চালাতেন। স্থাবর সম্পত্তি বলতে ওই বসতভিটেটাই। একটা মেয়ে ছিল নিখিলবাবুর, পাশের গাঁয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন। ছেলেটাকে বিকম পাস করিয়েছিলেন কষ্টেসৃষ্টে। তারপর টুপ করে মারা গিয়েছিলেন। আগেই বউটার স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটেছিল।

ধরণীবাবু একেবারে একা হয়ে গিয়েছিলেন। গ্রামের বুড়ো হেডমাস্টারের পরামর্শে শহরে চলে এসেছিলেন। ব্যাংকের চাকরিটাও পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপর একটা দুইটা পদ পেরিয়ে অ্যাকাউন্টেন্টের পদে থিতু হয়েছিলেন। বিয়ে করবার বছরকয়েক পরে বউ পরামর্শ দিয়েছিলেন—গাঁয়ের ভিটেটা রেখে লাভ কী? বেচে দিয়ে কিছু ক্যাশ টাকা হাতে নাও।

ধরণীবাবু বলেছিলেন, 'বলো কী তুমি! জন্মভিটে বলে কথা! মা-বাবার গন্ধ আছে না ওই ভিটেয়!'

ধরণীবাবুর স্ত্রী বড় ঠান্ডামাথার মহিলা। বুদ্ধিও রাখেন বেশ।

বলেছিলেন, 'তুমি তো আর তৈলারদ্বীপ ফিরে যাচ্ছো না। শহরেই তো থাকবে। শহরের মাটি এত মিঠা যে বুড়ো বয়সেও ফিরে যেতে ইচ্ছে করবে না। তাছাড়া...।' বলে থেমেছিলেন বউটি।

ধরণীবাবু জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন স্ত্রীর দিকে। বলেছিলেন, 'তাছাড়া?'

'তোমার জেঠাতো ভাইয়েরা মাস্তান টাইপের। গ্রামেই থাকে। প্রভাব প্রতিপত্তি তোমার চেয়ে বেশি। এক ফাঁকে তোমার পৈতৃক ভিটেটাই দখল করে বসবে।' স্ত্রী বলেছিলেন।

'ধূর, কী যে বলো না তুমি!'

'মাথা ঠান্ডা করে আমার কথাটি ভেবে দেখো তুমি। আমাদের ছেলেটি এখনও বালক। যদি ভিটেটা দখলই করে ফেলে ওরা, করবেটা কী তুমি? কী করতে পারবে?' ধীরে ধীরে বলেছিলেন বউটি।

চুপ মেরে গিয়েছিলেন ধরণীবাবু। বউ তো ঠিকই বলছেন! জেঠাতো ভাইয়েরা তিন ভাই। উনি তো একা! তাছাড়া ওরা মাস্তান ধরনের। ওদের সঙ্গে পেরে উঠবেন কেন তিনি? তাহলে এখন কী করা উচিত তাঁর?

বউটি যেন তাঁর মনের কথা বুঝতে পারলেন। বললেন, 'শোন, আমি একটি জায়গা দেখেছি। তিন কাঠার। গোলাপ সিংহ লেনে। ওপারে চলে যাবে ওরা। বলছে, উচিত দাম পেলে বিক্রি করে দেবে।'

আর দোনামনা করেননি ধরণীবাবু। জন্মভিটেটা বিক্রি করে দিয়ে গোলাপ সিংহ লেনের জায়গাটি কিনে নিয়েছিলেন। ম্যানেজারের স্বাক্ষর জাল করে মেরে দেওয়া টাকা দিয়ে ওই জায়গায় তেতলাটি তুলেছিলেন।

দোতলার পশ্চিমের ফ্ল্যাটে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকেন ধরণীবাবু। অন্য পাঁচটা ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়েছেন। ওই ভাড়ার টাকায় তার সংসার চলে স্বচ্ছন্দে। ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছেন, বুয়েট থেকে। ঢাকার একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে ভালো বেতনের চাকরিও পেয়ে গেছে সুলাল। গেল বছর জাঁকজমকে বিয়ে করিয়েছেন ছেলেকে। বউ নিয়ে সুলাল ঢাকাতেই থাকে। পুজো-উৎসবে বাপের বাড়িতে দু'চারদিন সপরিবারে থেকে যায় সুলাল।

ব্যাংকের চাকরির পর আর কোনো চাকরি করেননি ধরণীবাবু। হাতে অঢেল টাকা। চাকরির দরকার কী? বছর দুই ঘর তৈরিতে গেল।

থিতু হবার পর বউ বলল, 'চাকরির দরকার নেই আর। ভাড়ার টাকা তো কম না! তাছাড়া ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। ও বেরিয়ে এলে টাকা

খরচের কোনো পথই থাকবে না আমাদের। এখন থেকে খাবেদাবে আর আমাকে দেখবে।'

'মানে!'

'বুড়ো খোকা, বুঝছ না কী বলছি?' বুকের আঁচলটা আলগা করে সুদেষ্ণা বলেছিলেন।

এতক্ষণে বুঝতে পেরেছিলেন বউয়ের কথার মানে। চেয়ার ছেড়ে সুদেষ্ণাকে পেছন থেকে জাপটে ধরেছিলেন।

সুদেষ্ণা গলায় রস ছড়িয়ে বলেছিলেন, 'পেছনে কেন, সামনে জড়াও।'

সেদিন থেকে ধরণী-সুদেষ্ণার দাম্পত্যজীবনের চেহারাটাই পাল্টে গিয়েছিল। জড়াজড়ি, চুমোচুমি, ভালোবাসাবাসি।

পাল্টাবেও না কেন? সুদেষ্ণা তো আর দেখতে মলয়া-স্বপ্না-রত্নার মতো নারী নন! আধুনিক কালের মানুষেরা খাসা বা বিন্দাস শব্দ যেজন্য ব্যবহার করে, সুদেষ্ণা ছিলেন সেরকমই। ছিলেন বলছি কেন, এই তিপ্পান্ন বছর বয়সেও তাঁর দিক থেকে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। একবার তাকানোর পর ঘুরে আরেকবার তাকাতে ইচ্ছে করে। পাঁচ ফুট সাড়ে চারের সুদেষ্ণা। কালো নন। আবার ফরসা বললে উপহাস বোঝাবে। কালো আর গৌরবর্ণের মাঝামাঝি গায়ের রং। কোমর ছাড়ানো চুল। এই তিপ্পান্নতেও একটা চুল পাকেনি। তবে আগে যেরকম ঝাঁকড়া ছিল, এখন সেরকম নেই। চুল একটু পাতলা হয়ে এসেছে এই যা। শরীরের গাঁথুনি ভালো। স্তনযুগল এখনও ঈর্ষণীয়ভাবে পুরুষ্টু, উন্নত।

সুদেষ্ণার শরীর নিয়ে ধরণীবাবুর দিন কাটে, রাত কাটে। সুদেষ্ণাও ধরণীবাবুকে উসকান। একে তো খালি ফ্ল্যাট, তার ওপর সুদেষ্ণার লোভনীয় শরীর! রসেবশে কাটতে থাকে ধরণীবাবুর জীবন।

ষাট পেরোনোর পর ধর্মকর্মের দিকে ঝুঁকলেন ধরণীবাবু। পাশের গলির শ্যামকালী মন্দিরে যাতায়াত শুরু করলেন তিনি। মাঝেমধ্যে দু'একটা ধর্মসভায় বক্তৃতাও দিতে শুরু করলেন। বক্তৃতা দিতে গিয়ে বুঝলেন, ধর্মগ্রন্থ আর শাস্ত্রাদি ভালো করে পাঠ না করলে বক্তৃতা ঠিকঠাকমতো জমবে না। তিনি 'গীতা', 'রামায়ণ', 'পুরাণ'—এসব পড়া শুরু করলেন। বেশি করে পড়তে লাগলেন 'মহাভারত'।

পড়তে পড়তে তাঁর ঘোর লেগে গেল। আরে! মানবজীবনের সব কথাবার্তা তো 'মহাভারতে' সন্নিবেশিত! প্রেম-অপ্রেম-পরকীয়া-উল্লাস-

ক্ষরণ-হত্যা-গুপ্তহত্যা সবই তো আছে এই গ্রন্থে! মানুষের বহির্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্গত-জীবনের কথা লিখতেও তো ভোলেননি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস!

ধরণীবাবু 'মহাভারত' পড়েন আর ভাবেন। ভাবেন আর মানুষকে বোঝান। এখন শ্যামকালী মন্দিরে, সপ্তাহে অন্তত একটি সন্ধ্যায়, কথা বলতে হয় তাঁকে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ভক্তরা একত্রিত হয় মন্দির প্রাঙ্গণে। ওইদিন মন্দিরের পুরোহিত শ্রীনিত্যানন্দ ভট্টাচার্যও ধর্মকথা শোনান শ্রোতাদের। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা শ্লোকসমাকীর্ণ, নীরস। পুরোহিতের বক্তৃতা শুনতে শুনতে উসখুস করতে থাকে শ্রোতারা। বারবার ধরণীবাবুর দিকে তাকায়। কখন ভট্টাচার্য মশাইয়ের বক্তৃতা শেষ হবে, কখন ধরণীবাবু বক্তৃতা দেওয়া শুরু করবেন—এই আশায় থাকে।

ধরণীবাবু বক্তৃতা দিতে শুরু করলে হাততালি পড়ে, শেষ হলে আরও জোরে। বক্তৃতায় কী এমন বক্তব্য থাকে যে, মানুষেরা তাঁর কথা শুনবার জন্য পাগলপ্রায়? ভাবেন ধরণীবাবু। তিনি ধর্মকে যুক্তিগ্রাহ্য বাস্তবজগতে এনে দাঁড় করান, পুরাণকাহিনিকে মানবকাহিনির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে একটা স্বস্তিকর বিশ্বাসের জগৎ তৈরি করে দেন শ্রোতাদের সামনে। শ্রোতারা তখন ভাবতে বসেন—সত্যিই তো, ধর্ম তো কোনো অধরা কল্পলোকের বস্তু নয়, যাকে নিছক পুরাণকাহিনি বলে এতদিন উড়িয়ে দিয়েছে, তা তো এই গার্হস্থ্যজীবনের চৌহদ্দিতে সংঘটিত হয়ে চলেছে অবিরাম!

গত পরশু সন্ধেয় ধরণীপ্রসাদ চক্রবর্তী বক্তৃতা দিলেন পাণ্ডু আর তাঁর দুই স্ত্রীকে নিয়ে। দুই যুবতি স্ত্রী কুন্তী আর মাদ্রীকে নিয়ে পাণ্ডু বনবাসে গেছেন। অরণ্যচারী মানুষ যে রকম কৃচ্ছ্রসাধন করে, যেরকম শরীর-সংযমী হয়, ওরা কিন্তু সেরকম কিছু করেননি। বরং মৃগয়ায় গেলে মানুষ যেরকম আনন্দ ফুর্তি করে, তাঁরা তা-ই করেছেন অরণ্যমধ্যে।

হস্তিনাপুরে দুই স্ত্রীকে নিয়ে আরাম-আয়াসে দিন কাটছিল পাণ্ডুর। বড় ভাই ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ! অন্ধত্বের কারণে বয়োজ্যেষ্ঠ হয়েও রাজ্যচালানোর অধিকার পাননি তিনি। দেশ শাসনের অধিকার পেয়েছিলেন অনুজ পাণ্ডু। রাজা হবার অস্বস্তি তাঁকে পেয়ে বসেছিল। একদিন সব ছেড়েছুড়ে বনে যাওয়া মনস্থ করলেন পাণ্ডু। রাজ্যশাসনের যে অস্বস্তি, তা থেকে মুক্তি নিয়ে সস্ত্রীক বনে চলে গেলেন পাণ্ডু। অরণ্যবাসের একদিন পাণ্ডু মৃগয়ায় গেলেন। বধ করলেন এক হরিণীকে। হরিণ মূর্তি ধারণ করলেন। কিমিন্দম মুনি হরিণরূপ ধারণ করে বনের হরিণীকে সংগম করছিলেন। মানুষীতে অরুচি

ধরে গিয়েছিল বোধহয় ঋষি কিমিন্দমের! তাই তাঁর হরিণীতে উপগত হওয়া। পাণ্ডু তো আর মুনির বিচিত্র-বিদঘুটে রুচির কথা জানেন না! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম মৃগয়া। সেই ধর্মই পালন করেছেন পাণ্ডু।

কিন্তু সংগমে ব্যর্থ মুনি পাণ্ডুকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন, 'হে পাণ্ডু, তুমি স্ত্রীতে উপগত হতে পারবে না আর কোনোদিন। তোমার বাসনা জাগবে স্ত্রীসংগমের কিন্তু ওই ইচ্ছের বশবর্তী হয়ে স্ত্রীসংগমে রত হলে তোমার মৃত্যু হবে। এই আমার অভিশাপ।'

'ক্ষত্রিয়ের ধর্ম মৃগয়া, আপনি যে হরিণরূপ ধারণ করে মানবেতর প্রাণীতে কামের পরিতৃপ্তি ঘটাচ্ছেন, তা তো আমার জানার কথা নয়! আপনি আপনার অভিশাপ ফিরিয়ে নিন মুনিবর।' এরকম নানা যুক্তি দেখিয়ে ক্ষমা চাইলেন পাণ্ডু কিমিন্দম মুনির কাছে।

কিন্তু মুনির এককথা—আজ থেকে তুমি অভিশপ্ত পাণ্ডু। কোনো নারীতে উপগত হয়েছ তো মরেছ!

অরণ্যগৃহে ফিরে প্রিয়তমা স্ত্রী কুন্তীকেই শুধু অভিশাপের কথাটা বললেন। কুন্তী নিজে সাবধান হলেন, মাদ্রীকেও সাবধান করলেন।

পাণ্ডু স্ত্রীকে পাশে নিয়ে আদর করেন, উপগত হবার প্রস্তুতিপর্ব সমাপন করেন। কিন্তু স্ত্রীসংগমের চরম তৃপ্তি লাভ করতে পারেন না। কিমিন্দমের অভিশাপের কথা তাঁর মনে পড়ে যায়। ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যান তিনি। সংগমেচ্ছা নিমিষেই উধাও হয়ে যায় তাঁর মন থেকে। শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ে। বিব্রতাপন্ন মন নিয়ে পাশ ফিরে শোন পাণ্ডু। স্ত্রীরা অস্বস্তিময় শরীর নিয়ে শয্যা থেকে উঠে যান।

সেদিন শ্যামাকালী মন্দিরের বক্তৃতা শেষে বাড়ি ফিরে 'মহাভারত' নিয়ে বসেন ধরণীবাবু। পুনরায় পড়তে থাকেন পাণ্ডু-কুন্তী-মাদ্রীর অংশটি। এই কাহিনি পড়তে পড়তে নিজের মধ্যে একধরনের অস্বস্তি অনুভব করতে থাকেন ধরণীপ্রসাদ চক্রবর্তী।

গত মাসছয়েক ধরে তিনিও যেন পাণ্ডুর মতন হয়ে গেছেন। তবে পাণ্ডু আর তাঁর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। পাণ্ডুর মধ্যে উত্তেজনা আছে, কিন্তু স্ত্রীসংগমে অভিশপ্ত। ধরণীবাবুকে কেউ অভিশাপ দেয়নি, তারপরও ইদানীং তিনি সুদেষ্ণাসংগমে ব্যর্থ। সুদেষ্ণা পাশে শুয়ে থাকেন, শরীরের কাপড়চোপড় আলুথালু করে রাখেন। যে স্তনযুগলে তিনি বিয়ে-পরবর্তী দিন থেকে আসক্ত, সেই পুরুষ্টু স্তন দুটো এখন আর তাঁকে আকুল করে না। তাঁর

সকল শারীরিক উত্তেজনা মরে গেছে যেন! আগে সময়ে অসময়ে সুদেষ্ণার শরীর নিয়ে খেলা করতেন ধরণীপ্রসাদ, এখন মোটেই ইচ্ছে করে না এসব করতে। ভেতরের সকল কাম সমাধিপ্রাপ্ত হয়ে গেছে যেন!

একদিন লজ্জা ত্যাগ করে সুদেষ্ণা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে তোমার! আমার দিকে তাকাও না যে, আগের মতো!'

'পারি না।' সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরণীবাবুর।

'মানে!' অবাক চোখে মৃদু কণ্ঠে বলেন সুদেষ্ণা।

'এখনও তোমাকে আগের মতো পেতে ভীষণ ইচ্ছে করে আমার। কিন্তু নেওয়ার যে শক্তি, তা আমার ফুরিয়ে গেছে! আমি পাণ্ডুর মতো অভিশপ্ত নই, কিন্তু কী এক অলক্ষিত দৈব-অভিশাপে আমার সবকিছু শেষ হয়ে গেছে রে সুদেষ্ণা!' বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন ধরণীপ্রসাদ চক্রবর্তী।

দূর দিগন্তে অন্ধকার

এক.

বৈকুণ্ঠ।

এখানে দুঃখ-অপমান-নিরাশা-প্ররোচনা-লালসা-রিরংসার বড় অভাব। এখানে যা আছে, তা শুধু ভালোবাসাবাসি, শুধু সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য।

বৈকুণ্ঠে কারও প্রতি কারও পক্ষপাতিত্ব নেই, নেই আবার ঔদাসীন্যও। সবাই সবাইকে ভালোবাসে, আবার সবাই সবার প্রতি নির্মোহ। এখানে কারও প্রতি কারও হিংসা নেই, নেই কোনো বিতৃষ্ণাও। ক্রোধ বৈকুণ্ঠ থেকে চিরতরে নির্বাসিত। এখানকার অধিবাসীদের লোভ-ভোগেচ্ছা একেবারেই নির্বাপিত। বৈকুণ্ঠে নেই কোনো হানাহানি, নেই নারী বা ভূমির অধিকার পাওয়ার জন্য হিংস্রতা। এখানে কেউ কারও একার নয়, সবাই সবাকার। এখানে দ্রৌপদী দুর্যোধনের পাশ ঘেঁষে বসে খোশগল্পে মাতোয়ারা হন, শকুন্তলা দুষ্মন্তকে এড়িয়ে যুধিষ্ঠিরের কোলে মাথা রেখে বিশ্রাম নেন। শূর্পণখা লক্ষ্মণকে বগলদাবা করে নির্জন অরণ্যের দিকে এগিয়ে যায়। ভীম রাধার পেছন পেছন ঘুর ঘুর করেন। এখানে কৃষ্ণের বাঁশি শুনে রাধিকা উতলা হন না। চিরকুমার যে ভীষ্ম, অপ্সরী মেনকার দিকে হাঁ-করে তাকিয়ে থাকেন, কখন মেনকা চোখে ঝিলিক তুলে মুচকি একটু হাসে! ধনুর্ধর দ্রোণাচার্য তীর-তলোয়ার ছেড়ে সুরাপাত্র হাতে দিন কাটান।

বৈকুণ্ঠে অশান্তি নেই, বৈকুণ্ঠে চিরকালীন বসন্ত। এখানকার মানুষগুলোর মনে কোনো আগল নেই। সত্য কথা দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করে বসেন এঁরা।

দুই.

দশরথ অযোধ্যার রাজা। সুজলা-সুফলা তাঁর দেশ। ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। কোনো কিছুরই খামতি নেই রাজা দশরথের। তাঁর পত্নীর সংখ্যা সাড়ে তিনশো। তাঁদের মধ্যে রানিই তিনজন— কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা। প্রধান মহিষী কৌশল্যা। কৈকেয়ী তাঁর রূপ-যৌবন-ছলাকলার কারণে

দশরথের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এঁদের নিয়ে দশরথের সুখের জীবন, কিন্তু স্বস্তির নয়। অস্বস্তির কারণ, রাজা দশরথ অপুত্রক। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে' ভার্যা বলে শাস্ত্রে যে একখানা কথা আছে, তা মেনে সাড়ে তিনশো পত্নী সংগ্রহ করেও রাজা দশরথ পুত্রের মুখ দেখলেন না। কুলগুরু পরামর্শ দিলেন পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করতে। এই যজ্ঞ কোনো এক খ্যাতিমান ঋষির পৌরহিত্যে সুসম্পন্ন করতে পারলে রানিদের গর্ভে পুত্র জন্মাবে।

দশরথ কুলগুরুর কথা মানলেন। পুত্রেষ্টিযজ্ঞের আয়োজন করলেন। ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে আনা হলো যজ্ঞের পৌরহিত্য করতে। যজ্ঞশেষে ঋষ্যশৃঙ্গ রানিদের পায়েস দিলেন, সাদা পায়েস, ভক্ষণ করতে। তিন রানি ভাগ করে ওই পায়েস উপভোগ করলেন। পুত্রসন্তান হলো তিন রানির— কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত আর সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। জমজ ওরা।

কালে কালে বড় হলো ছেলেরা। রাজা দশরথ বুড়ো হলেন। বড় ছেলে রামচন্দ্রকে যুবরাজ নির্বাচন করতে চাইলেন দশরথ। বাধ সাধলেন কৈকেয়ী।

বললেন, 'রামের চেয়ে আমার ছেলে ভরত উপযুক্ত। অযোধ্যার যুবরাজ হয়ে ভবিষ্যতে অযোধ্যা-অধিপতি হবার সকল গুণ ভরতের আছে। সুতরাং রামকে বাদ দিয়ে ভরতকেই যুবরাজ করুন মহারাজ।'

দশরথ দোনামনা করলে অতীতের প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলেন কৈকেয়ী। দশরথ একসময় কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছাপূরণের অঙ্গীকার করেছিলেন।

দশরথ বাধ্য হলেন কৈকেয়ীর কথা শুনতে। দশরথ শুধু ভরতকে যুবরাজ করে রেহাই পেলেন না, রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বছরের বনবাসে পাঠাতে বাধ্য হলেন।

স্ত্রী সীতা আর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে নিয়ে রাম বনবাসে গেলেন। পঞ্চবটী বনে পর্ণকুটির তৈরি করে তিনজনে বসবাস শুরু করলেন।

রামচন্দ্ররা আর্য, পঞ্চবটী অঞ্চলটা অনার্য-শাসিত। ওই রাজ্যের রাজা কপিরাজ বালী। বালীর রাজধানীর নাম কিষ্কিন্ধ্যা। তার স্ত্রীর নাম তারা। সুগ্রীব বালীর সহোদর। এরা অনার্য। আর্য রামদের চোখে এই কালাকোলা মানুষগুলো মানুষ নয়, বানর। রামের মধ্যে এই অনার্য-অঞ্চলে আর্যশাসন প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগল। সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন রাম আর লক্ষ্মণ। একদিন সেই সুযোগ এসে গেল।

চৌদ্দ বছরের বনবাসকালের তেরো বছর পার হয়ে গেছে। রামরা যখন বনবাসে আসেন, তখন তাঁরা যুবক-যুবতি। সন্তানধারণের উপযুক্ত বয়স সীতার। অরণ্যমধ্যে সুখের দাম্পত্যজীবন কাটলেও সীতার গর্ভে সন্তান আসে না।

কিষ্কিন্ধ্যার পশ্চিমে সমুদ্রের মাঝখানে স্বর্ণলঙ্কা। স্বর্ণলঙ্কার নৃপতি রাবণ। রাবণের বোন শূর্পণখা একদিন অরণ্যভ্রমণে এসে লক্ষ্মণকে দেখে কামাতুর হয়। লক্ষ্মণ শূর্পণখার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। শুধু তা-ই নয়, শূর্পণখার প্রেমনিবেদনের অপরাধে তার নাক-কান কেটে নেন লক্ষ্মণ। বোনের অপমানের প্রতিশোধ নিতে রাবণ সীতাকে অপহরণ করে। রাম-লক্ষ্মণ সীতা উদ্ধারে বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু কী প্রকারে সীতা করবেন তাঁরা! তার জন্য চাই বাহুবল। রাবণ মহাবলবান নৃপতি। তার সামরিক শক্তি প্রবল। তাকে পরাজিত করতে হলে অন্য একটা পরাশক্তির সঙ্গে আঁতাত করতে হবে। শক্তিতে রাবণের উপযুক্ত প্রতিপক্ষ বানররাজ বালী। কিন্তু বালী আর্যের পক্ষে দাঁড়াবে কেন? কেন তারই মতো অন্য এক অনার্যরাজার ক্ষতি করবে? বুঝতে পেরে রাম বালীর ভাই সুগ্রীবকে কাছে টানলেন। সুগ্রীবের প্ররোচনায় নিরাপরাধী বালীকে হত্যা করলেন। তারাকে বিধবা করলেন রাম, অঙ্গদকে করলেন পিতৃহারা। সুগ্রীব বানররাজ্যের রাজা হলো। সুগ্রীব বউদি তারাকে ভোগদখলে নিল। এবং লঙ্কাভিযানে রামকে সসৈন্যে সহযোগিতা করল সুগ্রীব।

লঙ্কায় গিয়েও বিশ্বাসঘাতক জুটে গেল। রাবণের সহোদর বিভীষণ এসে জুটল রামচন্দ্রশিবিরে। বিভীষণ সুগ্রীবের ওপিঠ। সুগ্রীবের মতো বিভীষণও সিংহাসনলোভী। রাবণ বেঁচে থাকতে সেই লোভ সফলতা পাবে না। তাই সীতা প্রত্যার্পণের অছিলা তুলে রামের দলে এসে ভিড়ল বিভীষণ। মূলত বিভীষণের প্ররোচনা-প্রণোদনায় সহোদর কুম্ভকর্ণ নিহত হলো, ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদকে হত্যা করা হলো। রাবণের একলক্ষপুত্র আর সোয়ালক্ষ নাতি রামপক্ষের হাতে নিহত হলো। শেষ পর্যন্ত রাবণকেও প্রাণ দিতে হলো রামের হাতে। অনার্যরাজ্য লঙ্কা আর্যরাজপুত্র রামের শাসনাধীনে চলে এলো।

রামচন্দ্র তখন শ্রীলঙ্কার বেলাভূমিতে সীতার জন্য অপেক্ষা করছেন। অশোকবন থেকে মুক্তি পেয়ে বেলাভূমি বেয়ে রামের দিকে এগিয়ে আসছেন সীতা। হাঁটার ভঙ্গি দেখে রামের মনে হলো— সীতা গর্ভবতী, রাবণকর্তৃক অপবিত্র হয়েছেন সীতা। অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন করা হলো। পরীক্ষায়

উতরে গেলেন সীতা। আপাতত রামের সন্দেহদৃষ্টি থেকে রক্ষা পেলেন সীতা, কিন্তু অযোধ্যায় ফিরে প্রজাদের খরতর বাক্যবান থেকে রেহাই পেলেন না। রাবণকে সীতার সঙ্গে জড়িয়ে নানারকম কুৎসা রটনা করতে থাকল প্রজারা। স্ত্রীর চেয়ে প্রজাদের বেশি মূল্য দিলেন অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র। ছলনার আশ্রয় নিয়ে লক্ষ্মণের মাধ্যমে গর্ভবতী সীতাকে অরণ্যে নির্বাসনে পাঠালেন রাম। সেখানে সীতার লব ও কুশ নামে দুজন সন্তান জন্মাল।

এদিকে রামরাজা অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন করলেন। বাল্মীকির প্রণোদনায় রাম সীতাকে অযোধ্যায় নিয়ে এলেন। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানে সীতাকে যথাযথ মর্যাদা দিলেন না রামচন্দ্র।

অপমানে জর্জরিত সীতা পৃথিবীকে অনুরোধ করলেন বিদীর্ণ হতো। পৃথিবী বিদীর্ণ হলো। সীতা ভূমধ্যে অন্তর্হিত হলেন।

আরও কিছু বছর রাজত্ব করে রামচন্দ্র দেহত্যাগ করলেন।

এরপর বহু বহু শতাব্দী কেটে গেল।

এখন রামায়ণযুগের এবং মহাভারতকালের সবাই বৈকুণ্ঠবাসী।

তিন.

বিশাল উদ্যান। কী নেই এই উদ্যানে? পারিজাত থেকে সকল ধরনের ফুল, নানা জাতের বৃক্ষ, ঝরনা, উদ্যানের মাঝখান দিয়ে বাঁকা-সোজা হাঁটাপথ, বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বৃক্ষছায়ায় মনোরম বাঁধানো আসন, খোলা বাগানে অলসভাবে সময় কাটানোর নরম ঘাসবিছানো স্থান— সবই আছে এই স্বর্গ-উদ্যানে। এই উদ্যানে খ্যাত-অখ্যাতরা বিকেলটা কাটান। ইন্দ্র, অর্জুন, একলব্য, কচ, উর্বশী, কর্ণ, কংস, কুন্তী, গঙ্গা, গান্ধারী, দময়ন্তী, দুর্যোধন, সীতা, মন্দোদরী, দ্রৌপদী, বিভীষণ, বালী, তারা, মনসা, মহাদেব, বাল্মীকি, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র— এঁরা সবাই ওই স্বর্গ-উদ্যানে ঘুরে বেড়ান। কেউ লাঠিতে ভর দিয়ে টুক টুক করে হাঁটেন, কেউ-বা একস্থানে দাঁড়িয়ে ব্যায়ামের নানারকম কসরত করেন।

আজ উদ্যানটা জমে উঠেছে। নারদ বীণা বাজিয়ে পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন। চোখ খোলা তাঁর। যদি কারও সঙ্গে কারও ঝগড়াটা লাগিয়ে দেওয়া যায়! অন্যদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করতে না পারলে তিনি যে সুখ পান না! কোনো রূপসীকে মনে লাগে কিনা, খুঁজে ফিরছেন ইন্দ্র। মনসা সর্পহাতে মহাদেবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। স্বর্গে এসে নতুন একধরনের

সর্পের সন্ধান পেয়েছেন তিনি। মহাদেবকে তা না দেখিয়ে যে স্বস্তি নেই মনসার! ধৃতরাষ্ট্র কুম্ভকর্ণের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে মেতেছেন।

ওই, একটু ওদিকে বৃত্তাকার একটা জটলা দেখা যাচ্ছে। কাছে গিয়ে বোঝা গেল, নারীরা কানামাছি খেলছেন। চারদিকে সীতা, তারা, মন্দোদরী, রাধা, দময়ন্তী আর মাঝখানে চোখবাঁধা যুধিষ্ঠির। সীতার ওড়না দিয়ে যুধিষ্ঠিরের দু'চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। যুধিষ্ঠির দু'হাত প্রসারিত করে নারীদের কোনো একজনকে ধরতে চাইছেন। কিন্তু নারীদের ছোঁয়া কি অত সহজ! তাঁরা এই ধরা দেন তো এই দূরে চলে যান! সীতাদের হাতে পড়ে যুধিষ্ঠিরের নাস্তানাবুদ হবার উপক্রম। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি মোটেই বিরক্ত নন, বরং উল্লসিত, উদ্বেলিত। যে দ্রৌপদীনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির, সেই যুধিষ্ঠির আজ পরনারী সংস্পর্শে আনন্দে আকুল। খেলার একপর্যায়ে যুধিষ্ঠির সীতাকে ধরে ফেলেন। ধরেই বুকের একেবারে গভীরে টেনে নেন।

ওই সময় পাশ দিয়ে রামচন্দ্র যাচ্ছিলেন। এই দৃশ্য দেখে তাঁর ভেতরটা রি রি করে উঠল। তিনি উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ছিঃ ছিঃ, ছিঃ!'

চট করে চোখের বাঁধন খুলে ফেললেন যুধিষ্ঠির। অবাক চোখে রামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

তৎক্ষণাৎ রামের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন সীতা। তাঁর চোখেমুখে ঘৃণা আর ক্রোধের মেশামেশি। সীতা নিজেকে সংযত করতে চাইলেন। ভাবলেন, স্বর্গে তো কারও মনে ক্রোধ বা ঘৃণার উদ্রেক হবার কথা নয়! তাহলে রামের জন্য তাঁর মনে ক্রোধ-ঘৃণার ঝড় কেন? ভেবে কূল পান না সীতা!

রামকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞেস করেন, 'এই ছিঃ ছিঃ কেন? কার জন্য?'

'এই ধিক্কার তোমার জন্য। পরপুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করতে লজ্জা করছে না তোমার?' রামের কণ্ঠস্বর উষ্মায় ভরা।

হি হি করে হেসে উঠলেন সীতা। বললেন, 'পরপুরুষ! এখানে পরপুরুষ দেখলে কোথায় তুমি! এখানে তো সবাই আপনপুরুষ। সবাই সবার এখানে!'

'মানে!' অবাক চোখে বলেন রাম।

সীতা বলেন, 'ওই দেখ, দ্রৌপদী কংসের গায়ে ঢলে পড়তে পড়তে হেসে কুটিকুটি। আর তোমার প্রিয়তম ভাই লক্ষ্মণকে দেখ, স্ত্রী ঊর্মিলাকে বাদ দিয়ে শূর্পণখাকে বুকে জড়িয়ে কোন দিকে যাচ্ছে! আরও দেখবে, দেখ ভীষ্মমাতা চিরযৌবনা গঙ্গা ব্যাধপুত্র একলব্যের সঙ্গে কী করছেন! ওঁদের দেখে তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না এই বৈকুণ্ঠে কেউ কারও একার নন?'

'ও হ্যাঁ আরেকটি কথা, এই পরপুরুষ-সংসর্গের অভিযোগ তুমি আগেও একবার আমার বিরুদ্ধে করেছিলে।' রূঢ় কণ্ঠে কথা শেষ করলেন সীতা।

রামচন্দ্র বললেন, 'আগেও একবার করেছিলাম!'

'মনে নেই তোমার, না মনে না-থাকার ভান করছ?' বললেন সীতা।

'কখন করেছিলাম এই অভিযোগ? কোথায়?' জানতে চান রাম।

সীতা বললেন, 'রাবণের কারাস্থান অশোকবন থেকে মুক্তি পাওয়ার পর স্বর্ণলঙ্কার বেলাভূমি বেয়ে যখন আমি প্রবল আবেগে কাঁপতে কাঁপতে তোমার দিকে এগিয়ে আসছিলাম, তুমি তখন আমার দিকে তর্জনী বাড়িয়ে বলেছিলে, আর এগিয়ো না। তুমি কলঙ্কিতা, রাবণ তোমাকে অপবিত্রা করেছে। কী, বলো নি?'

রাম আমতা আমতা করে বললেন, 'বলেছিলাম, তবে তা দশজনের কুৎসা থেকে তোমাকে বাঁচাবার জন্য।'

'মিথ্যে! মিথ্যে বলছ তুমি রাম!' রোষে ফেটে পড়লেন সীতা। 'দশজনের কুকথা থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্য নয়, বরং তোমার মনের মধ্যে যে সন্দেহ মাথা কুরে মরছিল, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবার জন্য।'

রাম এবার মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'বালির ওপর দিয়ে তোমার হেঁটে আসার ভঙ্গি দেখে আমার মনে হয়েছে, তুমি গর্ভবতী। প্রকৃতপক্ষে তা-ই ছিলে তুমি। তুমি তো বেশ কিছুকাল আমার সংস্পর্শে ছিলে না! তাহলে তোমার পেটে সন্তান এলো কোত্থেকে?'

সীতা বললেন, 'যেদিন আমায় রাবণ অপহরণ করল, তার একমাস আগে থেকে আমার মাসিক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি সময় ও সুযোগ খুঁজছিলাম তোমাকে বলব বলে। কিন্তু তা হলো না। আমি মায়াহরিণের ফাঁদে পড়লাম, তোমরা দুইভাই সোনার হরিণের পেছনে ছুটলে।' থামলেন সীতা। তাঁর বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

সীতা আবার বলতে শুরু করলেন, 'অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন করলে তুমি! গনগনে আগুনের মধ্যদিয়ে হাঁটালে তুমি আমায়! কেন? আমি সতী কিনা তা পরখ করার জন্য। পা দুটো আমার পুড়ে গেল! দুর্বিষহ যন্ত্রণাকে বুকের তলায় চেপে আমি তোমার কাছে হেঁটে এলাম। কী করলে তুমি তখন? এমন একটা ভাব করলে, যেন অগ্নিপরীক্ষা কিছুই না! অপহরিত নারীর এরকম শাস্তি পাওয়া উচিত! এই অপহরণের জন্য আমি দায়ী ছিলাম কি? না তোমরা দুই ভাইয়ের নিষ্ঠুর আচরণ দায়ী ছিল? একজন তরুণী অন্য এক তরুণের কাছে প্রেমনিবেদন করতেই পারে! শূর্পণখাও লক্ষ্মণের কাছে

প্রেমনিবেদন করেছিল। প্রেমনিবেদন কি অপরাধ? অন্যের চোখে অপরাধ না হলেও তোমরা দুই ভাইয়ের বিচারে অপরাধ ছিল। তাই তো তোমার প্ররোচনায় আমারই চোখের সামনে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক-কান কেটে নিল!'

একটু ফাঁক পেয়ে রামচন্দ্র বললেন, 'আমি একপত্নীনিষ্ঠ ছিলাম, লক্ষ্মণও তা-ই। তাই অনার্যকন্যার ওই অসভ্য আচরণ আমরা সহ্য করিনি।'

'হাসালে তুমি আমায় রাম! একপত্নীনিষ্ঠ! তোমরা! যাদের পিতা একপত্নীতে তৃপ্ত নন, তাদের আবার পত্নীনিষ্ঠতা! তুমি সুযোগ পাওনি বলে বহুচারী হতে পারো নি। সুযোগ পেলে ঠিকই বাপের মতো হতে।'

রাম ক্রোধে জ্বলে উঠলেন, 'তুমি ন্যায়-অন্যায় বিস্মৃত হচ্ছো সীতা।'

এবার সীতাকে বাম হাত দিয়ে সরিয়ে রামের সামনে এগিয়ে এলো তারা। ঘৃণা মেশানো গলায় বলল, 'চিনতে পারছেন আমায়, রামচন্দ্র! শুনেছি মর্ত্যে আপনি নাকি অবতারের স্বীকৃতি পেয়েছেন! রামাবতার! দশ অবতারের একজন! ত্রেতাযুগের মহান পুরুষ! পরশুরামের পরেই নাকি আপনার স্থান! তা জিজ্ঞেস করি, কোন ন্যায়ধর্ম পালনের ফলে আপনি যুগাবতার রূপে নির্ণিত হলেন! আপনিই তো ঋষি শম্বুককে হত্যা করেছিলেন! তখন তো আপনি অযোধ্যার রাজা! রাজধর্ম তো প্রজাপালন! কিন্তু আপনি কী করলেন, ব্রাহ্মণদের উসকানিতে শূদ্র ঋষি শম্বুককে হত্যা করলেন! ঋষি শম্বুকের অপরাধ কী ছিল?'

রাম দ্রুত বলে উঠলেন, 'শূদ্র হয়ে আর্য-শাস্ত্র পাঠ করছিল। তপস্যা করছিল আর্যঋষিদের মতন। শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণের মতো আচরণ করা তার অধিকারে ছিল না।'

'মানে আপনি মানুষে মানুষে ভেদাভেদে বিশ্বাসী। ছোট জাতের লোক হয়ে শম্বুক কেন বামুনের মতো পঠন-পাঠন-ধ্যান করবেন? তা-ই তো তাঁকে হত্যা করলেন আপনি? বুকে হাত দিয়ে বলুন, শম্বুককে হত্যা করে ন্যায় কাজ করেছেন আপনি?'

তারার প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না রাম। মাথা নিচু করে রাখলেন। তারা বলল, 'আমার বিশ্বাস, আপনি আমাকে চিনতে পারেননি।'

রামচন্দ্র ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়লেন।

বিষণ্ন কণ্ঠে তারা বলল, 'আমি বালীর স্ত্রী।'

তার পর কণ্ঠে শ্লেষ মিশিয়ে বলল,' ভুল বললাম, আমি সুগ্রীবের জোর করে বিয়েকরা বউ।'

'জোর করে বিয়েকরা বউ!' রাম বললেন।

'লোকে তো তা-ই বলে!' বলে অনেকক্ষণ চুপ থাকল তারা।

তারপর সজল চোখে বলল, 'অন্যায়ভাবে আমার স্বামী বালীকে হত্যা করলেন আপনি! নিরস্ত্র বালীকে আত্মরক্ষার সুযোগ না দিয়ে আড়াল থেকে কাপুরুষের মতো তীরাঘাতে হত্যা করে আপনি ন্যায় কাজ করেছেন? বলুন। মাথা হেঁট করে আছেন কেন? সেই কাপুরুষ রাম আজ সীতাকে শেখাচ্ছেন ন্যায়-অন্যায়ের মানে! ধিক আপনাকে, ধিক্কার জানাই আর্যসমাজের সেই বিধানকে, যে-বিধান অনার্যদের রাক্ষস আর বানর হিসেবে চিহ্নিত করেছে!'

বালীর কথা মনে পড়ে গেল শ্রীরামচন্দ্রের। বালী ছিল কপিরাজ। তার রাজধানীর নাম ছিল কিষ্কিন্ধ্যা। কিষ্কিন্ধ্যা নয়নশোভিত রাজ্য। বানরাধিপতি বালী প্রজারঞ্জক। বালী অসাধারণ শক্তিশালী ছিল। এমন যে বাহুবলী রাবণ, তার চেয়েও অধিক বলশালী ছিল বালী। রাবণ আর বালীর মধ্যে গভীর সখ্য ছিল। বালীর সহোদর সুগ্রীব ছিল সিংহাসনলোভী। দাদাকে সরিয়ে কিষ্কিন্ধ্যার ক্ষমতাদখলে আগ্রহী ছিল সুগ্রীব। কিন্তু বালীর কৌশল আর শক্তির সঙ্গে পেড়ে উঠত না সুগ্রীব। সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় ছিল সে? একটা সময়ে সুগ্রীবের হাতে সুযোগ এসে গেল।

রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতা তখন অপহরিত। পাগলের মতো সীতাকে খুঁজে ফিরছেন রাম আর লক্ষ্মণ। পাহাড়-সমতল-নদী উপত্যকা-অরণ্য-লোকালয় কোনোটাই বাদ যাচ্ছে না দুই ভাইয়ের অনুসন্ধান থেকে। বড় ভাই বালীকে হত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়ে সুগ্রীব। কিষ্কিন্ধ্যা থেকে বিতাড়িত সুগ্রীব তখন গহিন অরণ্যে লুকিয়ে আছে। ওখানেই সুগ্রীবের সঙ্গে রামের দেখা। সুগ্রীবের কাছ থেকে রাম সম্যক জানতে পারলেন, লঙ্কাধিপতি রাবণই সীতাকে হরণ করেছে। এবং সুগ্রীব সীতা-উদ্ধারে রামকে সাহায্য করবে, যদি রাম বালীকে হত্যা করে তাকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বানিয়ে দেন।

এককথাতেই রাজি হয়ে গিয়েছিলেন রাম। ভাবেননি, যে-বালীকে হত্যা করতে বলছে সুগ্রীব, তার তেমন কোনো অপরাধ আছে কিনা? বালী হত্যাযোগ্য কিনা? একজন নিরপরাধীকে হত্যা করলে রামের কোনো অন্যায় হবে কিনা? এর কোনোটাই ভাবেননি রামচন্দ্র। শুধু সীতা-উদ্ধারের বাহানা দিয়ে অনার্যভূমি শ্রীলঙ্কা দখল করার উদ্দেশে বালীহত্যার মতো নিষ্ঠুর আর অন্যায় কাজ করতে সম্মত হয়ে গিয়েছিলেন রামচন্দ্র। সম্মত হয়েই ক্ষান্ত হননি রামচন্দ্র, সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধরত বালীকে অন্তরাল থেকে তীক্ষ্ণ শরাঘাতে বধ করেন। সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করে দেন রামচন্দ্র। সুগ্রীব জোর করে বউদি তারাকে তার অঙ্কশায়িনী করে। তারা সহজে কি রাজি

হয়! রামের প্ররোচনায় সুগ্রীব তারাপুত্র অঙ্গদকে হত্যা করবার হুমকি দেয়। পুত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তারা তার সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে সুগ্রীবের শয্যাসঙ্গিনী হয়। এরপর তারা যতদিন জীবিত ছিল, আত্মশোচনায় বিদীর্ণ ছিল।

তাই আজ রামকে বৈকুণ্ঠধামে বাগে পেয়ে ছাড়বে কেন তারা?

রামচন্দ্র ম্যাড়মেড়ে গলায় বলেন, 'তুমি আমায় ভুল বোঝ না তারা। সেদিন পরিস্থিতির চাপে পড়ে দিশা হারিয়েছিলাম আমি। ভালো আর মন্দের বিচার ক্ষমতা হারিয়ে গিয়েছিল আমার। সুগ্রীবের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম।'

গর্জে উঠল তারা, 'রাখুন আপনার ভাওতাবাজি। বিভ্রান্তি! পরিস্থিতির চাপ, দিশেহারা ভাব— এসব বলে আমাকে স্তোক দেবেন না। আপনি অত্যন্ত ধূর্ত রামচন্দ্র। আপনি জানতেন, আপনি আমার স্বামী বালীর সঙ্গে দেখা করে সাহায্য চাইলে, বালী কিছুতেই রাজি হতো না। কারণ সে সুগ্রীবের মতো বিশ্বাসঘাতক ছিল না, ছিল না ভোঁতাবুদ্ধির। বালী অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিল। আপনার কথা শুনে সে ঠিকই ধরে ফেলত, সীতা-উদ্ধারের ব্যাপারটা আপনারই সাজানো নাটক। সীতা-উদ্ধারের নাম করে বানর নামের অনার্যদের সহায়তায় রাক্ষস নামের আরেক অনার্যদের দেশ দখল করতে চাইছেন। সুগ্রীবের আহম্মকিতে তো কিস্কিন্ধ্যাতে আর্যশাসন প্রতিষ্ঠা করেছেনই, আপনার লক্ষ্য তখন রাক্ষসরাজ রাবণশাসিত শ্রীলঙ্কা দখল। আপনার এই অপকর্ম কিছুতেই মেনে নিত না বালী। সেটা সঠিকভাবেই জানতেন আপনি। তা-ই আমার নিরপরাধী স্বামীকে হত্যা করলেন আপনি!' দম ফুরিয়ে এলো তারার। চুপ মেরে গেল সে।

রাম কিছু একটা বলতে চাইলেন। কিন্তু তারার যুক্তির সামনে পড়ে তাঁর মুখের রা বন্ধ হয়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তাঁর অন্য কোনো উপায় থাকল না।

সীতা বললেন, 'তুমি আমার চোখ খুলে দিলে তারা! আমি তো এতদিন ভেবে এসেছি, আমার প্রিয়তম স্বামী রাবণের হাত থেকে আমাকে মুক্ত করার জন্য প্রাণপাত যুদ্ধ করেছে! আজকে তোমার কথা শুনে এবং রামের নিরুত্তর থাকা দেখে আমি সব বুঝতে পারলাম। হাঃ স্বামী! হাঃ রামচন্দ্র!'

রামচন্দ্র বলে উঠলেন, 'চুপ থাকো সীতা। তুমি ওরকম করে বলো না। তুমি অন্তত আমাকে ভুল বোঝ না। আমি তোমাকে ভালোবাসি সীতা, সত্যিই ভালোবাসি।'

'থুঃ দিই তোমার সেই ভালোবাসার মুখে। এখন বুঝতে পারছি, তোমার সেই দিনের ভালোবাসা কত মেকি ছিল! আচ্ছা তুমি বলো, জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে এনে তুমি আমাকে অযোধ্যায় নিয়ে এলে। এরপর একবারও কি তুমি আমার পায়ের তলাগুলো দেখতে চেয়েছো, একবারও কি জিজ্ঞেস করেছো, দগ্ধ পা নিয়ে কষ্ট পাচ্ছো সীতা? একটি বারের জন্যও শুধাও নি তুমি আমায়, আমার দুর্মর যন্ত্রণার কথা শুনতে চাও নি। আচ্ছা, একবারও কি রাজবদ্যিকে বলেছো আমার চিকিৎসা করতে?' বলে গেলেন সীতা।

রামচন্দ্র বললেন, 'অযোধ্যায় ফিরেই আমি রাজকার্যে জড়িয়ে পড়েছিলাম। রাজ্যের চারদিকে বিশৃঙ্খলা তখন। কোনো কোনো করদরাজা বিদ্রোহও করে বসেছে। তাদের দমন করতে আমার অনেকটা সময় কেটে গেছে।'

'যখন আমাকে দেখার সময় হলো, ততদিনে কান ভারী হয়ে গেছে তোমার। প্রজারা ধুয়ো তুলেছে আমি অসতী, আমার পেটে যে সন্তান, তা রাবণের। শুধু প্রজারা তো নয়, কয়েকজন মন্ত্রীও তোমাকে ভুল বোঝাতে শুরু করল! আমার সান্নিধ্য তখন তোমার কাছে কাঙ্ক্ষিত নয়। আমি তো তখন গর্ভবতী! গর্ভবতী নারী তো স্বামীর চাহিদা পূরণ করতে পারে না! তাই সেই সময় তুমি আমার সান্নিধ্য একেবারেই এড়িয়ে চলতে। প্রজারা তোমাকে বোকা বানাতে সক্ষম হলো। নিজেকে প্রজাদের কাছে আরও প্রিয় করে তুলবার জন্য আমার প্রতি অবিচার করলে তুমি! বনবাসে পাঠালে!'

'আর বলো না সীতা! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে!' মৃদু কণ্ঠে বললেন রামচন্দ্র।

সীতা উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, 'লজ্জার কথা এত মিউ মিউ করে বলছো কেন?'

তারপর গলাকে আরও চড়িয়ে সঙ্গিনীদের উদ্দেশ করে সীতা বললেন, 'শোনো তোমরা, রামের নাকি লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে! সেদিন, যেদিন তুমি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে লক্ষ্মণকে দিয়ে গর্ভবতী আমাকে নির্বান্ধব অরণ্যে নির্বাসনে দিলে, তোমার এই মাথাটা কোথায় ছিল রামচন্দ্র? থুঃ লক্ষ্মণের মুখে, আমি নাকি তার মায়ের সমান! এই মায়ের সমান অসহায় বউদিটিকে বনে ফেলে রেখে রাজধানীতে চলে আসতে একবারের জন্যও বুক কাঁপেনি লক্ষ্মণের। ভ্রাতৃ-আজ্ঞা পালন করেছে লক্ষ্মণ! আসলে কী জানো, তোমরা পুরুষেরা সবাই নারীনির্যাতনকারী। সেই নারী স্ত্রী হোক বা জননী, ভগিনী

হোক বা মাসি, পিতামহী হোম বা মাতামহী, নারীনির্যাতনের বেলায় তোমরা সবাই এককাট্টা। কেউ রেহাই পায় না তোমাদের হাত থেকে।'

সীতার কথা শুনে অন্য নারীরা একসঙ্গে বলে উঠল, 'তুমি যথার্থ বলেছো সীতা। আমরাও তো পৃথিবীতে জীবন কাটিয়ে এসেছি। এটা ঠিক, আমরা সকলে একসমাজের মানুষ ছিলাম না, তারপরও বললে ভুল হবে না, সব পুরুষ নিপীড়িক। নারীদের ওপর জুলুমবাজি করতে কোনো পুরুষই বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।'

রামচন্দ্র আর কী বললেন! চোরা চোখে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকাতে থাকলেন। মন্দোদরী দেখতে পেল তা।

সরোষে মন্দোদরী বলল, 'আরে রামচন্দ্রজী, কার দিকে অমন চোরাচোখে তাকাচ্ছেন? উনিও কি আপনার চেয়ে কম যান? উনি তো আপনার চেয়ে একশো গুণ বাড়া! আপনি তো বউকে নির্বাসনে পাঠিয়ে ক্ষান্তি দিয়েছিলেন, আর যুধিষ্ঠিরবাবু, তিনি তো মহাজুয়াড়ি! জুয়ার নেশায় বউ দ্রৌপদীকে দুর্যোধনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন! কী, ঠিক না ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির?'

যুধিষ্ঠির একপা দুইপা করে সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

সূর্যের আলো নিভে আসতে শুরু করেছে তখন। দূর দিগন্তে অন্ধকার নেমে গেছে।

রামচন্দ্র সেই অন্ধকারের দিকে ধীর পায়ে এগোতে থাকলেন।